ISSN 1605-2021

লোকপ্রশাসন সাময়িকী
একবিংশতিতম সংখ্যা
ডিসেম্বর ২০০১; পৌষ ১৪০৮

লোকপ্রশাসন সাময়িকী

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা

লোক প্রশাসন সাময়িকী

একবিংশতিতম সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০১/পৌষ ১৪০৮

সৌজন্য সংখ্যা

সম্পাদনা পরিষদ

মোশারফ হোসেন
সৈয়দ শামসুল আলম
মোঃ সিরাজুল ইসলাম
কাজী হাসান ইমাম
বেগম কঙ্কা জামিল

সম্পাদক

এস, এম, জোবায়ের এনামুল করিম

লোক প্রশাসন সাময়িকী

একবিংশতিতম সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০১/পৌষ ১৪০৮

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের
ত্রৈমাসিক জার্ণাল

সম্পাদক ঃ এস, এম, জোবায়ের এনামুল করিম

© বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ১৪০৮

টেলিফোন	ঃ	৭৭১০০১০-১৬ (পিএবিএক্স)
ফ্যাক্স	ঃ	৭৭১০০২৯
ই-মেইল	ঃ	bpatc@bangla.net
বিপিএটিসি গ্রন্থাগার	ঃ	৩৫১.০০০৫
প্রচ্ছদ	ঃ	কাজী আজাদ
মূল্য	ঃ	১৮০ টাকা US $ 10
মুদ্রণে	ঃ	**ইছামতি অফসেট প্রেস** ১/১ হাজীপাড়া, রামপুরা ঢাকা-১২১৯। ফোন ঃ ৯৩৬২৫৯০, ৯৩৩৬০৩৮

LOK PROSHASON SAMOEEKY

Vol. 21, December 2001/Poush 1408

Quarterly Journal of
Bangladesh Public Administration Training Centre

Editor : S. M. Zobayer Enamul Karim

© Bangladesh Public Administration Training Center 1408

Telephone	:	7710010-16 (PABX)
Fax	:	7710029
E-Mail	:	bpatc@ bangla. net
BPATC Library	:	351.0005
Price	:	TK. 180 US $ 10

• লোকপ্রশাসন সাময়িকীতে প্রকাশিত প্রবন্ধসমূহের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধকারদের। প্রবন্ধে প্রকাশিত মতামত প্রবন্ধকারদের একান্ত নিজস্ব এবং এর জন্য সম্পাদনা পরিষদ কোন দায়িত্ব বহন করে না।

লোক প্রশাসন সাময়িকী
একবিংশতিতম সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০১/পৌষ ১৪০৮

সূচিপত্র

বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়ন ঃ
সহায়ক কৌশল ও নীতিমালা ১
ডঃ এম, কামাল উদ্দিন

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে গণপ্রতিনিধি এবং জন-প্রশাসনের সম্পর্ক ঃ
বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিতে ২৫
অধ্যাপক মোঃ আলী আশরাফ
আইরিন পারভিন

বাংলাদেশে দারিদ্রের গতি-প্রকৃতি এবং দারিদ্র বিমোচনে
গৃহীত সরকারি ও বেসরকারি কার্যক্রম ৩৭
আ, ক, ম, মাহবুবুজ্জামান

বাংলাাদেশে শিল্পায়ন ঃ তিন দশকের অভিজ্ঞতা ৫৭
মোঃ আমজাদ হোসেন

Towards the Management of Forest in a Sustainable Way : Views from the Chittagong Forest Areas ৯১
Dr. Sultana Mustafa Khanum

The Concept of 'Sustainable Development' : Weights on Improving Saving Rates and Protecting Environment. ১০৯
Md. Moniruzzaman

ISSN 1605-2021

লোকপ্রশাসন সাময়িকী
একবিংশতিতম সংখ্যা,
ডিসেম্বর ২০০১, পৌষ ১৪০৮

বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়ন ঃ সহায়ক কৌশল ও নীতিমালা

ডঃ এম, কামাল উদ্দিন *

Strategies & Policies for Harnessing Sustainable Development of SMEs in Bangladesh

- Dr. M. Kamal Uddin

Abstract : Small, Medium & Cottage Enterprises (SMEs) render enormous potential socially as well as economically in a developing country like Bangladesh. It possesses the potency lobring out revdution puring industrial growth and economic development including proliferation of earning and new employment opportunities. SMEs occupy about 80 percent in the industrial sector of this country. But until now, no recognized framework of classification of different types of industries of this sector has been formulated in the national context. The SMEs have succumbed to lose its pace & dynamism due to lack of appropriate policies & strategies. A defined structure of various industries under SMEs in the context of Bangladesh has been presented in this paper sub-dividing the industries into four sub-sectors. A framework of core policy in each sub-sector has been proposed. In order to promote SMEs proposed policy imperatives have been highlighted which are to be adopted by the Government and associated public organizations. By identifying various existing problems of this industrial sector, a multifaceted general and conducive policies & strategies to accelerate sustainable development of SMEs in the country have been propounded in this paper. This paper is an outcome of a research study and sample survey conducted recently on 30 selected SMEs under IAT, BUET-Industry-FBCCI linkage program.

---

* সহযোগী অধ্যাপক, ইনষ্টিটিউট অব এ্যাপ্রোপ্রিয়েট টেকনোলজী, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

ভূমিকা

ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প (Small & Medium Enterprise (SMEs) বাংলাদেশের অর্থনীতিতে একটি অনন্য স্থান দখল করে আছে। এ শিল্প সেক্টর বাংলাদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে আসছে। ব্যক্তিখাতের (Private Sector) সার্বিক উন্নয়ন এই সেক্টরের উপর নির্ভরশীল। বর্তমান যুগে ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প সেক্টর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের চাবিকাঠি হিসেবে পরিগণিত হয়েছে যা নতুন নতুন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক উৎকর্ষ সাধনের ক্ষেত্রে মজবুত ভিত রচনা করছে। বাংলাদেশে শিল্প কল-কারখানায় নিয়োজিত মোট শ্রমিকের শতকরা ৮৭ ভাগ এবং মোট মূল্য সংযোজিত পণ্যের (value added products) শতকরা ৩৩ ভাগ ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প থেকে যোগান প্রাপ্ত। যদি ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পকে বৃহৎ শিল্পের সাথে তুলনা করা যায় তাহলে দেখা যায় বাংলাদেশে শতকরা ৯৮ ভাগ শিল্পই ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প সেক্টরের অন্তর্গত। বাংলাদেশে ১৯৭ ধরনের মোট ৩৮২৯৪টি ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প রয়েছে (BSCIC Survey Report, 1994)। দশ অথবা তদুর্ধ কর্মচারীর সংখ্যার প্রেক্ষাপট বিবেচনায় অতি সাম্প্রতিক তথ্য অনুসারে দেখা যায় দেশের সামগ্রিক উৎপাদন সংশ্লিষ্ট শিল্প ইউনিটের শতকরা ৭৮ ভাগ শিল্প ইউনিটে শ্রমিকের সংখ্যা ১০ থেকে ৫০ জনের মধ্যে এবং শতকরা ৫৬ ভাগ শিল্প ইউনিটে শ্রমিকের সংখ্যা ১০ থেকে ২০ জনের মধ্যে (GOB, 1993 F:xi)। আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থাসমূহ শুধুমাত্র কুটির শিল্পের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেয়ার অতীত নীতি বর্জন করে তাদের অগ্রাধিকর চিহ্নিত করেছেন ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের দিকে। বুয়েট কর্তৃক সদ্য সমাপ্ত ৩০টি ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের উপর একটি নমুনা জরিপ এবং বুয়েট-ইন্ডাষ্ট্রী এফ, বি,সি,সি, আই লিংকেজ প্রোগ্রামে কিছু গবেষণা কার্যক্রমের উপর ভিত্তি করে প্রবন্ধটি রচিত হয়েছে।

২.০ ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের সংজ্ঞা ও শ্রেণীবিন্যাস

ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের স্বীকৃত কোন সংজ্ঞা এখনও প্রণীত হয়নি। শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক ও উদ্যোক্তাগণ ক্ষুদ্র ও মাজারী শিল্পকে চিহ্নিত করেছেন এমন প্রতিষ্ঠানকে

যা অত্যন্ত বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান নয়। সবচেয়ে ক্ষুদ্র শিল্প যেমন কুটির শিল্প (Cottage Industry) থেকে শুরু করে মাঝারী শিল্প (Medium Industry) পর্যন্ত সকল শিল্পকে ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প সেক্টর (SMEs) হিসাবে অভিহিত করা যায়। কুটির শিল্প বলতে মূলত ঐ ধরনের স্বল্প পুঁজি বিনিয়োগকৃত শিল্প বুঝায় যেখানে স্বল্প সংখ্যক লোক কাজ করে এবং অনেক ক্ষেত্রে পরিবারের সদস্যরাও কাজ করে। বর্তমানে বিভিন্ন কুটির শিল্পে পরিবারের সদস্য ছাড়াও অতিরিক্ত শ্রমিক নিয়োগ করে পণ্য উৎপাদন করতে দেখা যায়। দেশের অগণিত হস্তশিল্প (Handicraft) কুটির শিল্পের অন্তর্গত। হস্ত চালিত তাঁত শিল্প মূলত টেক্সটাইল উপ-খাতের (Sub-sector) একটি কুটির শিল্প।

ব্যাপক অর্থে প্রক্রিয়াকরণ শিল্প (Processing Industry) ও সেবা শিল্প (Service Industry) এ দু'ধরনের শিল্পই শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসাবে সংজ্ঞায়িত। উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংযোজন এবং প্রক্রিয়াজাত পণ্যের মেরামত ও পুনঃসংস্কার সাধন প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের অন্তর্ভুক্ত। যন্ত্রপাতি কিংবা স্থায়ী সম্পদের উল্লেখযোগ্য ব্যবহারের মাধ্যমে যে সমস্ত সেবামূলক কর্ম সম্পাদিত হয় সে সমস্ত কর্ম সেবা-শিল্পের অন্তর্ভুক্ত। যে সমস্ত সেবাকর্মকে বর্তমানে শিল্প হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে তাদের তালিকা 'শিল্পনীতি-১৯৯৯' এর পরিশিষ্ট-১- পরিবেশিত হয়েছে।

বাংলাদেশের শিল্পের বর্তমান প্রেক্ষাপট বিবেচনা করলে দেখা যায় ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পগুলোকে চারটি উপ-ভাগে শ্রেণীবিভাগ করা যায় (ছবি নং ১ ও ছক নং১)।

(১) কুটির শিল্প (Cottage or Micro-Industries)

(২) অতিক্ষুদ্র শিল্প (Tiny Industries)

(৩) ক্ষুদ্র শিল্প (Small Industries)

(৪) মাঝারী শিল্প (Medium Industries)

ছক -১ : ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প (SMEs) এর প্রস্তাবিত সংজ্ঞা ও শর্তবালী

ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের উপবিভাজন	সংজ্ঞা ও শর্তাবলী
কুটির শিল্প (Cottage Industry)	এমন শিল্প প্রতিষ্ঠান যেখানে সর্বমোট ১৫ জনেরও কম শ্রমিক কাজ করে এবং স্থায়ী পুঁজি বিনিয়োগের পরিমাণ ১০ লক্ষ টাকা এর কম। হস্ততাঁত শিল্প ঃ টেক্সটাইল উপ-খাতের একটি কুটির শিল্প বা অতিক্ষুদ্র শিল্প।
অতিক্ষুদ্র শিল্প (Tiny Industries)	এমন শিল্প প্রতিষ্ঠান যেখানে (i) শ্রমিকের সংখ্যা ১৫ থেকে ১০০ পর্যন্ত এবং স্থায়ী পুঁজি বিনিয়োগের পরিমাণ ১ কোটি টাকার চেয়ে কম। অথবা (ii) শ্রমিকের সংখ্যা ১০০ এর চেয়ে কম এবং স্থায়ী পুঁজি বিনিয়োগের পরিমাণ ১০ লক্ষ টাকা থেকে ১ কোটি টাকা পর্যন্ত।
ক্ষুদ্র শিল্প (Small Industries)	এমন শিল্প প্রতিষ্ঠান যেখানে স্থায়ী (i) বিনিয়োগের পরিমাণ ১ কোটি টাকা থেকে ১৫ কোটি টাকা পর্যন্ত। শিল্পের ধরন ও প্রয়োজন অনুসারে শ্রমিক সংখ্যা যে কোন হতে পারে। অথবা (ii) শ্রমিকের সংখ্যা ১০০ এর চেয়ে বেশী এবং স্থায়ী পুঁজি বিনিয়োগের পরিমাণ ১৫ কোটি টাকার কম।
মাঝারী শিল্প (Medium Industries)	এমন শিল্প প্রতিষ্ঠান যেখানে স্থায়ী বিনিয়োগের পরিমাণ ১৫ কোটি টাকা থেকে ৩০ কোটি টাকা। শিল্পের ধরন ও প্রয়োজন অনুসারে শ্রমিক সংখ্যা যে কোন হতে পারে।

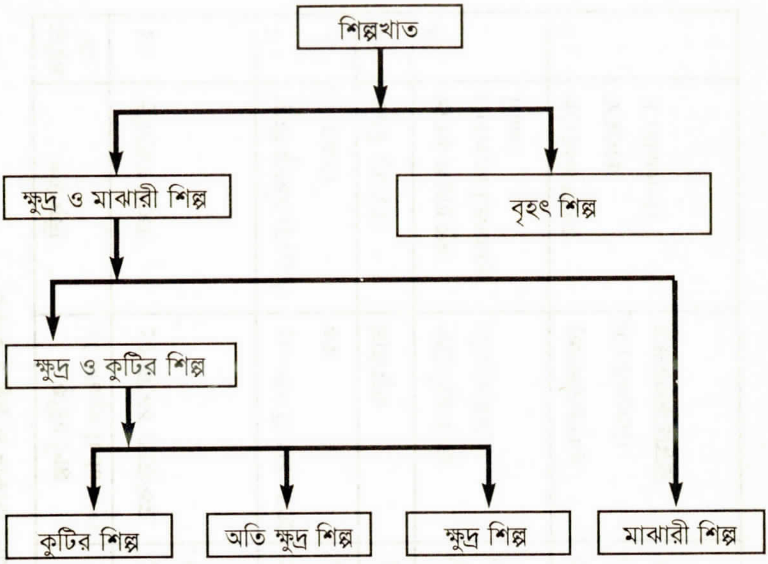

চিত্র ১ ঃ বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রকার শিল্পের শ্রেণী বিন্যাস

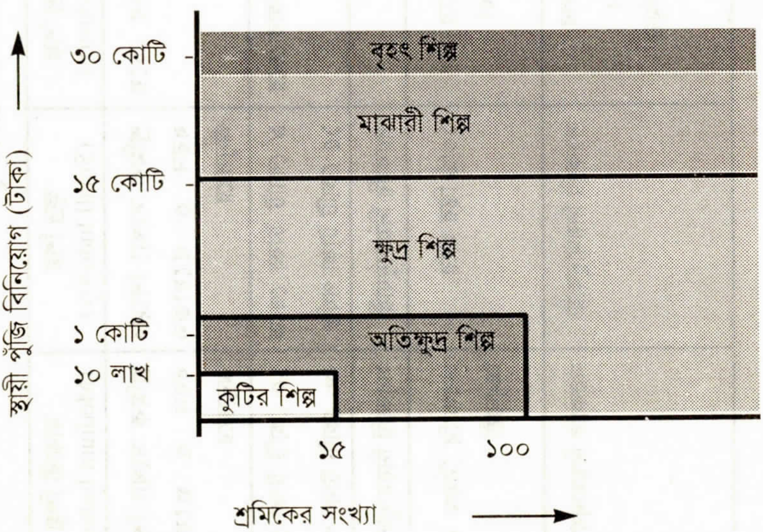

চিত্র ২ ঃ ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের সংজ্ঞা ও শ্রেণীবিন্যাস

ছক-২ ঃ ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের উন্নয়নের জন্য প্রস্তাবিত মূল নীতিমালা

ক্রমিক নং	শর্তাবলী	কুটির শিল্প (Cottage Industry)	অতি ক্ষুদ্র শিল্প (Tiny Industry)	ক্ষুদ্র শিল্প (Small Industry)	মাঝারী শিল্প (Medium Industry)
১।	শ্রমিকের সংখ্যা	১৫ জনের চেয়ে কম	১০০ জনের চেয়ে কম	শ্রমিক সংখ্যা শিল্পের ধরন ও প্রয়োজন অনুসারে	শ্রমিক সংখ্যা শিল্পের ধরন ও প্রয়োজন অনুসারে
২।	স্থায়ী মূলধন (Fixed Capital)	১০ লাখ টাকার চেয়ে কম	১ কোটি টাকার চেয়ে কম	৯ কোটি টাকা থেকে ১৫ কোটি টাকা পর্যন্ত	১৫ কোটি টাকা থেকে ৩০ কোটি টাকা পর্যন্ত
৩।	ভ্যাট (VAT)	ভ্যাটমুক্ত	ভ্যাটমুক্ত	সরকারি নিয়মানুযায়ী	সরকারি নিয়মানুযায়ী
৪।	ব্যাংক ঋণের সুদ (Interest Lending Rate)	৭% স্থির হারে (Flage Rate)	৮% স্থির হারে (Flage Rate)	১০% স্থির হারে	সরকারি নিয়ম নীতি অনুযায়ী
৫।	ব্যাংকের ঋণের জামানত (Collateral)	কোলেটারালের (Collateral) বাধ্যবাধকতামুক্ত	কোলেটারালের (Collateral) বাধ্যবাধকতামুক্ত	সরকারি নিয়মানুযায়ী	সরকারি নিয়মানুযায়ী

ক্রমিক নং	শর্তাবলী	কুটির শিল্প (Cottage Industry)	অতি ক্ষুদ্র শিল্প (Tiny Industry)	ক্ষুদ্র শিল্প (Small Industry)	মাঝারী শিল্প (Medium Industry)
৬।	সুদ মওকুফ সুবিধা (Interest Exemption)	যন্ত্রপাতি : ৫ বৎসর এবং কার্যনির্বাহী মূলধন (Working Capital): ৫ বৎসর	যন্ত্রপাতি : ৫ বৎসর এবং কার্যনির্বাহী মূলধন (Working Capital): ৫ বৎসর	যন্ত্রপাতি : ৩ বৎসর এবং কার্যনির্বাহী মূলধন (Working Capital): ৩ বৎসর	সরকারি নিয়মানুযায়ী
৭।	কর অবকাশ সুবিধা (Tax Holiday)	১০ বৎসর	১০ বৎসর	শহর ও মহানগরীরর জন্য ৭ বৎসর, স্বল্পোন্নত এলাকার জন্য ৮ বৎসর এবং অনুন্নত ও অসুবিধা প্রাপ্ত দূরবর্তী এলাকা (যেমন পার্বত্য চট্টগ্রাম) এর জন্য ১০ বৎসর	সরকারি নিয়মানুযায়ীঃ ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগ (পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি জেলা ব্যতিত): ৫ বৎসর খুলনা, সিলেট, রাজশাহী ও বরিশাল বিভাগ এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি জেলা : ৭ বৎসর
৮।	অবকাঠামো সুবিধা (Infrastructure Facility)	পানি, গ্যাস, টেলিফোন ও বিদ্যুৎ সংযোগ অগ্রাধিকারভিত্তিতে প্রদান করতে হবে। সুষ্ঠু বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।			

ক্রমিক নং	শর্তাবলী	কুটির শিল্প (Cottage Industry)	অতি ক্ষুদ্র শিল্প (Tiny Industry)	ক্ষুদ্র শিল্প (Small Industry)	মাঝারী শিল্প (Medium Industry)
৯।	ব্যাংক ঋণের জন্য সুপারিশ (Recommendation for Bank Loan)	সুপারিশ প্রদানকারী : সংশ্লিষ্ট খাতের এসোসিয়েশন (Sectoral Association) বা সংশ্লিষ্ট চেম্বার			
১০।	পণ্যের বিপণন সংক্রান্ত সহায়তা (Marketing Support)	পণ্যের বিপণন সহজতম ও বহুমুখী (Diversified) করার লক্ষ্যে সরকারি নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে। দেশে ও বিদেশে নতুন নতুন বাজার সৃষ্টি ও পণ্যের বিপণন সংক্রান্ত সহায়তা ও সুবিধা প্রদান করতে হবে।			
১১।	ব্যাংক ঋণ পরিশোধ সংক্রান্ত নীতিমালা (Repayment of Loan)	ব্যাংক ঋণ পরিশোধ করার প্রক্রিয়ায় Reducing Balance Method (RBM) অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয়। এ পদ্ধতিতে যদি ঋণ গ্রহীতা নিয়মানুযায়ী সময়মত ঋণের কিস্তির টাকা পরিশোধ করেন তাহলে Incentive হিসেবে উদাহরণ স্বরূপ প্রতি বছর ১% করে সুদেরহার কমানো যেতে পারে।			
১২।	নিবন্ধন (Registration)	প্রতিটি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে তাদের শ্রেণী বা Category হিসাবে নিবন্ধিত হতে হবে। স্থায়ী পুঁজি বিনিয়োগ সর্বোচ্চ ১৫ কোটি টকা হলে অর্থাৎ কুটির, অতিক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে বিসিক (BSCIC) এবং সংশ্লিষ্ট এসোসিয়েশন/চেম্বারে নিবন্ধিত হতে হবে। অপর দিকে স্থায়ী পুঁজি বিনিয়োগ ১৫ কোটি টকার উর্দ্ধে হলে			

আর্থিক সুবিধা প্রদানের জন্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিশেষ তহবিল গঠন করবে। উপ-ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানসমূহ যেখানেই অবস্থিত হোক না কেন তা ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের মতো প্রণোদনা (incentives) ও সুযোগ-সুবিধা পাবে।

৩.৪ ক্ষুদ্র শিল্প ঋণ নিশ্চয়তা স্কীম

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং সরকারি/ বেসরকারি বীমা প্রতিষ্ঠানের যৌথ সহযোগিতার মাধ্যমে ক্ষুদ্র শিল্প ঋণ নিশ্চয়তা স্কীম (The Small Industry Credit Guarantee Scheme) ব্যাপকভাবে চালু ও কার্যকর করবে।

৩.৫ বিশেষ রাজস্ব/আর্থিক সুবিধা

'অগ্রাধিকার প্রাপ্ত শিল্প খাত'' (Thurst Sector) হিসাবে চিহ্নিত শিল্প এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের ক্ষেত্রে বিশেষ রাজস্ব সুবিধা প্রদান করা হবে। এসব খাতে সরকার মাঝে মাঝে আর্থিক সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করবে।

৩.৬ বিদেশী বিনিয়োগকারীদের আহ্বান

বিসিক শিল্পনগরীতে শিল্প-ইউনিট স্থাপনের জন্য বিদেশী বিনিয়োগকারীদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।

৩.৭ শিল্প-প্লট বরাদ্দ

ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের জন্য বিসিক নিজস্ব শিল্প এলাকা এবং বিশেষ নির্দেশের আওতায় অন্তর্ভুক্ত শিল্প এলাকায় শিল্প-প্লট বরাদ্দ দেবে। অনুরূপভাবে, বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (BEPZA) তার নিজস্ব এলাকায় জমি বরাদ্দ দেবে। বিনিয়োগ বোর্ড (BOI)যেখানে সরকারি জমি আছে সেখানে জমি বরাদ্দ দেয়ার জন্য সুপারিশ করবে এবং ব্যবস্থা নিবে।

৪.০ ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রস্তাবিত বহুমুখী সাধারণ নীতিকৌশল

৪.১ ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের জন্য নির্দিষ্ট সহায়ক নীতিমালা

আমাদের দেশের বেশীর ভাগ ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প নীতিমালাবিহীন পরিবেশে জন্ম নেয় এবং দুর্বলভাবে বেঁচে থাকে। যেহেতু বাংলাদেশের শিল্প সেক্টরে ভিন্ন ভিন্ন

বৈশিষ্ট্যের বিভিন্ন শ্রেণী ও স্তরের শিল্প রয়েছে এ সেক্টরের জন্য একটি পৃথক নীতিমালা থাকা একান্ত প্রয়োজন। বৃহৎ শিল্পের সাথে সমভিত্তিক বিবেচনায় অসম প্রতিযোগিতা ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়নের ক্ষেত্রে বর্তমান প্রচলিত বাধাসমূহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৪.২ ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প সেক্টরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আন্ত:সংযোগ ও নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা

দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের মাঝে আন্ত:সংযোগ (Inter-firm Linkage) সম্প্রসারণ করতে হবে। এর জন্য ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প সেক্টরের জন্য একটি নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা প্রয়োজন। পেশাভিত্তিক এসোসিয়েশনসমূহ (Professional Associations) এবং জাতীয় চেম্বারসমূহ (National Chambers) এ ধরনের নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করতে পারে। সারাদেশ ব্যাপী এ সেক্টরের ছোট ও বড় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এবং বাংলাদেশ ও অন্যান্য দেশ যেমন SAARC, OIC বা অন্যান্য বন্ধু দেশের ছোট ও বড় প্রতিষ্ঠানের সাথে উপ-ঠিকাদারী (Sub Contracting) ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে। এ উদ্দেশ্যে Sub-Contracting Exchange Scheme (SES) প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। ঐ স্কীমের প্রধান কাজ হবে চাহিদা মোতাবেক বিভিন্ন পণ্য (যেমন ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প সামগ্রী বা Engineering Industrial Components) এর উপাত্ত এবং ঐ সকল পণ্যে বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানের তথ্য সংগ্রহ। এভাবে দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আন্তঃসংযোগ ও সহায়তা কার্যক্রম প্রসার সুদুরপ্রসারী ফল বয়ে আনবে। এতে তাদের মাঝে ফলপ্রসু সহযোগিতার একটি মজবুত ভিত্তি রচিত হবে এবং প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা ও সুবিধার সর্বোচ্চ ব্যবহার এর সুযোগ সৃষ্টি হবে। প্রাথমিক ধাপ হিসাবে প্রথমে এ শিল্প সেক্টরে আন্ত:সংযোগ ও সহায়তার ক্ষেত্রগুলো সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে হবে। যথোপযুক্ত নেটওয়ার্কের মাধ্যমে এ সেক্টর তাদের উন্নয়নের স্বার্থে সরকারি নীতিমালা প্রণয়ন ও বিভিন্ন কার্যক্রম তৈরির ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ ও সহায়তা করার সুযোগ পাবে।

৪.৩ সরকারি নীতিমালা

ছোট ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রণীত নীতিমালা শুধুমাত্র ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের জন্য নয় বরং সামগ্রিক সেক্টরের জন্য প্রণীত হওয়া প্রয়োজন। টেকসই

অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতি সরকারের অঙ্গীকারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে নীতিমালা প্রণয়ন করা উচিত, যাতে দেশের অর্থনৈতিক নীতিমালার সমস্ত বৈশিষ্ট্য ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের পরিকল্পনা মাফিক বিভিন্ন বর্ধিত কর্মকান্ডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সহায়ক হয় এবং জোরদার করা যায়। এর মধ্যে প্রধানত যে সকল সরকারি নীতিমালা বাস্তবায়ন করা দরকার সেগুলো হল ভ্যাট বা ট্যাক্স কমানো, সুদের হার কমানো, রেগুলেটরী সিষ্টেমের অপ্রয়োজনীয় বাধ্যবাধকতার বোঝা কমানো, শ্রমের অবাধ প্রবেশাধিকারের নিশ্চয়তা, পলিসিগত বাধাসমূহকে দূরীকরণ, অবৈধভাবে আসা পণ্যের সাথে অন্যায্য প্রতিযোগিতা প্রতিরোধকরণ, ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের জন্য সহায়ক নীতিমালা প্রণয়ন, এবং প্রকৃতভাবে প্রাইভেট ও পাবলিক সেক্টরের পার্টনারশীপ গড়ে তোলা।

৪.৪ বিনিয়োগ তহবিল, উদ্যোগী মূলধন, লিজিং এবং প্রাথমিক মূল তহবিল

ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পকে অর্থনৈতিক সুবিধা প্রদানের বিভিন্ন দিক উন্মোচন এবং বর্ধিত করা বড় প্রয়োজন। এর মধ্যে প্রাথমিক মূল তহবিল, লিজিং, উদ্যোগী মূলধন ও বিনিয়োগ তহবিল অন্যতম। দীর্ঘমেয়াদী ঋণের অপ্রতুলতা এবং অভাব, উচ্চ সুদের হার, ঋণের গ্যারন্টি বা সিকিউরিটি সংক্রান্ত বাধা, মুদ্রা বিনিময় সংক্রান্ত ঝুঁকি ইত্যাদি সমস্যাগুলো ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের সম্প্রসারণে বাধাস্বরূপ। স্বল্প ও দীর্ঘ ঋণ বা আর্থিক সহায়তা প্রচলিত বাজার অনুযায়ী এবং স্বল্প সুদে দেয়া উচিত।

৪.৫ ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের জন্য বর্ধিতভাবে অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদান

বিভিন্ন ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, এন, জি, ও (NGOs) ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের অর্থনৈতিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প সেক্টরে ব্যাপকভাবে কারিগরী ও অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদান করতে পারে, যা নতুন নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি এবং সামগ্রিক সেক্টরের উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখাবে।

৪.৬ ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে সমাজ উন্নয়ন কর্মসূচি ও দারিদ্র্য বিমোচন

ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প সেক্টরের মাধ্যমে মানব ও সমাজ উন্নয়নের ব্যাপক সুযোগ রয়েছে। দারিদ্রপীড়িত এ দেশের লোক সংখ্যার একটি বৃহৎ অংশ এ শিল্প-সেক্টরের মাধ্যমে উপকৃত হতে পারে। আমাদের সমাজের একটা বড় অংশ দারিদ্র্য সীমার নিচে

বাস করে যারা সুবিধা বঞ্চিত। তাদের সন্তানদের শিক্ষা দানের জন্য প্রয়োজনীয় আয় নেই। এমনকি জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য ন্যূনতম উপার্জনের কর্মসংস্থানও নেই। বাধ্য হয়ে তাদের ছেলে-মেয়েদেরকে নিম্ন শ্রেণীর কাজে (Odd jobs) লাগানো হয়। ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের মাধ্যমে সমাজ উন্নয়নের কর্মসূচি প্রণয়ন করা যায় যেখানে দুর্দশাগ্রস্ত পরিবারের লোকজন ন্যায্য মজুরীতে কাজ করতে পারে। এ ধরনের কর্মসূচিতে দেশি ও বিদেশি বিভিন্ন সংস্থাকে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে।

৪.৭ অগ্রাধিকার খাতসমূহ (Priority Sector or Thrust Sectors)

বাংলাদেশে কয়েকটি বিশেষ খাত যেমন কৃষিনির্ভর ও কৃষিসহায়ক শিল্প, তথ্য প্রযুক্তি খাত, ধাতব প্রকৌশল শিল্প, তৈরি পোশাক, হাল্কা প্রকৌশল শিল্প, ইত্যাদি উন্নয়নের উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে। তাই এ সমস্ত উপ-খাতগুলোর উন্নয়নে বিশেষ দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন এবং অগ্রাধিকার সেক্টর ঘোষণা দিয়ে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেয়া অত্যন্ত জরুরী।

৪.৮ ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের নতুন নতুন বাজারে প্রবেশ

E-Commerce এর মাধ্যমে এই শিল্পকে নতুন নতুন বাজারে প্রবেশ করানোর ব্যাপারে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে এবং সাথে সাথে বৈদেশিক বাজারে প্রবেশের সম্ভাব্যতা যাচাই করতে হবে। অন্যান্য দেশের সাথে বাণিজ্যিক সহযোগিতা জোরদার করা প্রয়োজন। বিশ্বায়নের পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সহযোগিতা অত্যন্ত জরুরী।

৪.৯ (ক) উদ্যোক্তাদের জন্য ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের বিভিন্ন কর্মকান্ড ও উদ্ভাবনী দক্ষতা উন্নয়নের উপর প্রশিক্ষণ

ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের বিভিন্ন কর্মকান্ড, উদ্ভাবন প্রক্রিয়া ও ব্যবসায় প্রশাসন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ বাংলাদেশে উদ্যোক্তাদের মেধা ও মনন, উদ্ভাবনী ক্ষমতা এবং জ্ঞান উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। উদ্যোক্তাদের জন্য প্রশিক্ষণ (Entrepreneural Training) এই শিল্প সেক্টরে উদ্ভাবন ও নতুন নতুন ব্যবসা সম্প্রসারণে দীর্ঘ মেয়াদী প্রভাব ফেলবে।

(খ) নিয়মিত পেশাগত প্রশিক্ষণ কোর্স

ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের শ্রমিক, কারিগর, কর্মচারি ও কর্মকর্তাদের জন্য নিয়মিত পেশাগত প্রশিক্ষণ কোর্সের ব্যবস্থা থাকা অতীব জরুরী। ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা, দক্ষ বিপণন ব্যবস্থা, প্রযুক্তির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য, পণ্যের গুণগত মান, আর্থিক যোগান ইত্যাদি সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের জন্য সুফল বয়ে আনবে। প্রযুক্তির মূল্যায়ন, ব্যবহার ও উদ্ভাবন সম্পর্কে তাদের জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে। প্রশিক্ষণ কোর্স, কর্মশালা ইত্যাদি নিয়মিত আয়োজনের মাধ্যমে শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্টদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও বর্ধিত জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করে প্রতিষ্ঠানের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করবে।

৪.১০ তথ্য নেটওয়ার্ক ও কেন্দ্রীয় উপাত্ত ব্যাংক

বিভিন্ন তথ্য যেমন বিভিন্ন বাজারের চাহিদার প্যাটার্ণ (Market Demand Pattern), মূল্য পরিবর্তনের ধারা এবং নীতিমালার কাঠামোর পরিবর্তন ইত্যাদি দ্রুত সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তি (IT) একটি ফলপ্রসূ হাতিয়ার হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। এতদুদ্দেশ্যে বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের জন্য একটি তথ্য নেটওয়ার্ক ও কেন্দ্রীয় উপাত্ত ব্যাংক গড়ে তোলা প্রয়োজন যা বিভিন্ন দেশি ও বিদেশী সংস্থা যেমন IDB, ICCI, বিদেশি ব্যবসায়িক সংস্থা ইত্যাদির সমন্বয়ে হতে পারে।

৪.১১ ব্যাপক ও পূর্ণাঙ্গ সহায়তা প্রদান

ব্যাপক ও পূর্ণাঙ্গ সহায়তা এই সেক্টর উন্নয়নে দীর্ঘ মেয়াদী ভূমিকা রাখতে পারে। অর্থনৈতিক এবং অ-অর্থনৈতিক (Non-Financial) উভয় বিষয়ের সমন্বয়ে সহায়তা ও সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রসারিত করা প্রয়োজন। ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের প্রয়োজনানুসারে সাহায্য ও সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে এমনরূপ করা উচিত যাতে উদ্যোক্তগণ সরাসরি উপকৃত হন এবং কোন প্রকার বিড়ম্বনার শিকার না হন।

৪.১২ প্রসুক্তির হস্তান্তর, বিকাশ ও উন্নয়ন

ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের জন্য প্রযুক্তি বাছাই, মূল্যায়ন, আত্মস্থকরণ, উদ্ভাবন, বিকাশ ও সম্প্রসারণ এবং হস্তান্তর প্রক্রিয়াকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে। বিশ্বায়নের যুগে প্রযুক্তিই প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার নির্ণায়ক। তাই অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সারাদেশব্যাপী প্রযুক্তির বিকাশ ত্বরান্বিত করতে হবে। এতদুদ্দ্যেশ্যে

প্রযুক্তির গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্র গড়ে তুলতে হবে। উন্নত বাজার অর্থনীতির দেশসমূহ হতে প্রযুক্তির জ্ঞান আহরণ এবং প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রক্রিয়া জোরদার করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। গবেষণা ও উন্নয়ন দক্ষতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বিদেশী জ্ঞান ও প্রযুক্তি আহরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। গবেষণা লব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিভিন্ন কার্যক্রম (যেমন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম, উপদেশ কার্যক্রম, পারস্পারিক ও যৌথ মতবিনিময় কার্যক্রম এবং গবেষণা সম্প্রসারণ কার্যক্রম) এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যবহারকারীর নিকট পৌছে দিতে হবে। ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রক্রিয়া একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী। রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিং এবং অন্যান্য পদ্ধতির মাধ্যমে আধুনিক প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রক্রিয়াকে জোরদার করা প্রয়োজন।

৪.১৩ ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের সম্প্রসারণ এবং বহুমুখীকরণ

সামগ্রিক শিল্প সেক্টরের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের বৃদ্ধির (Growth) উপর সর্বতোভাবে নির্ভরশীল। ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি এবং তাদের ফলপ্রসূ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে যাতে উৎপাদন ক্ষমতা বহুগুণে বর্ধিত করা যায়।

৪.১৪ আন্তর্জাতিক আর্থিক সহায়তার সন্ধান

জাতীয় উন্নয়ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান এর মাধ্যমে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা ব্যাংক, ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পকে আর্থিক যোগান দিয়ে থাকে। দেখা গেছে এ সমস্ত ঋণসুবিধা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে যথাযথভাবে সন্ধান করা হয় না বা খতিয়ে দেখা হয় না। জাতীয় উন্নয়ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান এর মাধ্যমে দাতা গোষ্ঠীর ঋণ প্রদান কার্যক্রমের প্রক্রিয়া খতিয়ে দেখতে হবে। যাতে আন্তর্জাতিক আর্থিক যোগান ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পে সহজলভ্য হয়।

৪.১৫ ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের জন্য আলাদা অর্থায়ন প্রতিষ্ঠান বা ক্ষুদ্র ব্যাংক প্রতিষ্ঠাকরণ

অর্থায়ন বাংলাদেশের ক্ষুদ্র মাঝারী শিল্পের উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশে এই অবস্থার শীঘ্র উন্নয়নের কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

সরকারি ও বেসরকারি খাতের যৌথ মালিকানাধীনে একটি আলাদা আর্থিক প্রতিষ্ঠান করা যেতে পারে। প্রতিষ্ঠানটিকে গতিশীল রাখার জন্য ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে কোন প্রকার কনসেশন (Concession)বা ছাড় দেয়ার কোন নিয়ম থাকবে না, বাজারে প্রচলিত হারেই মূলধনের খরচাদি প্রদান করার নীতি অবলম্বন করা হবে। ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে Reducing balance Method (RBM) প্রয়োগ করা যেতে পারে। এই পদ্ধতিতে কোন ঋণগ্রহীতা যথাযথভাবে ও সময়মত ঋণের কিস্তির টাকা শোধ করলে পরবর্তী বছরে সুদ প্রদানের হার কমে যাবে (উদাহরণ স্বরূপ বছরে ১% হ্রাস করা যেতে পারে)। অর্থায়নের আরেকটি উৎস হতে পারে শেয়ার বাজার থেকে। ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প সেক্টর `Group IPO Scheme (GIPS)' নামক একটি স্কীম চালু করে IPO শেয়ার বাজারে ছাড়তে পারে। `GIPS' এর ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের একটি গ্রুপ পাবলিক শেয়ার বাজারে ছাড়ার জন্য তাদের সম্পত্তি ব্যবহার করবে-এই পুরো প্রক্রিয়াটি একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় থাকবে। আরেকটি বিষয় হল উদ্যোক্তাদের জন্য উদ্যোগী মূলধন (Venture Capital) এর ব্যবস্থা করা। উদ্যোক্তাদের অর্থায়নে সহায়তা করার লক্ষ্যে উদ্যোগী মূলধন প্রতিষ্ঠান (Venture Capital Organization) প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আমেরিকা, ইউরোপিয়ান ইউনিয়নভুক্ত দেশসমূহ এবং কানাডাতে উদ্যোগী মূলধন অত্যন্ত কার্যকারভাবে সফলতা লাভ করেছে।

সার্বিকভাবে শিল্প সেক্টরের উন্নয়নের জন্য বিশেষত ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের জন্য ফলপ্রসূ কিছু করতে হলে সহজ অর্থায়নের অবকাঠামো গড়ে তুলতে হবে। একটি আলাদা ক্ষুদ্র ব্যাংক (Micro Bank) দেশে অর্থায়নের অচলাবস্থা অপসারিত করতে পারে। এই ক্ষুদ্র ব্যাংক বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সহায়তায় প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। এই উদ্যোগকে সাফল্যমন্ডিত করার জন্য দেশ ও বিদেশের বিশেষজ্ঞ ও সম্পদের সমাহার প্রয়োজন।

৪.১৬ ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের বিভিন্ন সমস্যাবলী প্রশমন

বাংলাদেশে বহু ধরনের ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প রয়েছে যারা অসংখ্য সমস্যার সম্মুখীন। প্রতিটি আলাদা আলাদা সেক্টরের কিছু নির্দিষ্ট সাধারণ সমস্যা রয়েছে। ঐ সমস্ত নির্দিষ্ট সমস্যাগুলো প্রশমিত করার জন্য প্রয়োজন কিছু বিশেষ সহায়তা। প্রতিটি খাতের নির্দিষ্ট সমস্যাগুলি ঐ খাতের আঙ্গিকে সমাধানে ব্রতী হতে হবে।

৪.১৭ ক্ষুদ্র মাঝারী শিল্পের জন্য সারাদেশে একই সংজ্ঞা প্রয়োগ

সারাদেশে বিভিন্ন প্রকার ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প রয়েছে। প্রত্যেক শ্রেণীর (Category) শিল্পের জন্য ঐক্যমতের ভিত্তিতে সংজ্ঞা প্রণয়ন করা প্রয়োজন যেটা সারাদেশের জন্য প্রযোজ্য হবে। প্রতিটি শ্রেণীর শিল্পের জন্য ষ্ট্যান্ডার্ড ইন্ডাষ্ট্রিয়াল কোড (Standard Industrial Code (SIC) দেয়া বাঞ্ছনীয়। সারাদেশের জন্য একই সংজ্ঞা ব্যাতিরেকে শিল্পনীতি প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়।

৪.১৮ ট্রেড ফেয়ার প্রদর্শনী, সিম্পোজিয়াম, সেমিনার এবং কর্মশালা

ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের জন্য ট্রেড ফেয়ার, প্রদর্শনী, সিম্পোজিয়াম, সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন নিয়মিতভাবে করতে হবে। ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের উপর বিভিন্ন গবেষণা ও তথ্য সংক্রান্ত প্রবন্ধ প্রতিটি শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিয়মিতভাবে সরবরাহ করা প্রয়োজন। দেশ ব্যাপী এসোসিয়েশনসমূহ বা চেম্বারসমূহ এলাকাভিত্তিক ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প পণ্য প্রদর্শনীর আয়োজন করতে পারে, যাতে ব্যাপক সংখ্যক ভোক্তা ঐ সব পণ্যের বৈচিত্র্য ও গুণগত মান সম্পর্কে অবহিত হতে পারেন।

৪.১৯ সমস্যা চিহ্নিতকরণের জন্য বিশেষ সেবামূলক কার্যক্রম প্রচলন এবং সমস্যা দূরীকরণের পূর্ণাঙ্গ প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা প্রণয়ন

ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো প্রায়ই তাদের সমস্যা সম্পর্কে সম্যকভাবে ওয়াকিবহাল নয় এবং ঐ সমস্যাগুলোর সর্বোত্তম প্রতিকারের জন্য তাদের নিজস্ব প্রয়োজন সম্পর্কেও তারা স্পষ্টভাবে জ্ঞাত নয়। তাই এমন একটি সেবামূলক কার্যক্রম প্রচলন করা প্রয়োজন যেটার সরাসরি শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে সংযোগ থাকবে এবং সমস্যা চিহ্নিতকরণসহ পূর্ণাঙ্গ প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা প্রণয়ন করে দিবে, যাতে ঐ চিহ্নিত সমস্যাগুলো কাটিয়ে শিল্পগুলো সফলতার দ্বারপ্রান্তে পৌছাতে পারে।

৪.২০ ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পগুলোর উন্নতিকল্পে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কার্যক্রম নীতিমালা

ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের প্রতিযোগিতামূলক যোগ্যতার উন্নয়নের লক্ষ্যে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কার্যক্রম অত্যন্ত প্রয়োজন। এজন্য প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে প্রতিযোগিতামূলক চ্যালেঞ্জ যা তাদেরকে মোকাবেলা করতে হবে-সে সম্পর্কে প্রতিষ্ঠানকে পূর্ণভাবে ওয়াকিফহাল রাখা। পরবর্তী পদক্ষেপ হচ্ছে ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পগুলোকে সাহায্য প্রদান যাতে তারা

চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় তৈরি হতে পারে। এটা হতে পারে তাদের যোগ্যতা ও দুর্বলতা নিরূপণের মাধ্যমে এবং তাদের সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে। প্রধান সহায়তার (inputs) মধ্যে আর্থিক সহায়তা, বাজার সম্পর্কে তথ্য প্রদান, প্রশিক্ষণ, ব্যবস্থাপনা কৌশল, প্রযুক্তি, দক্ষতা এবং সহায়তা সংস্থাগুলোর সাথে সংযোগ স্থাপন অন্যতম।

৪.২১ ব্যবসায় পরিবেশ সহায়ক হতে হবে

কম খরচে অর্থ যোগান, স্পষ্ট ও স্বচ্ছ নিয়মকানুন এবং দেশের সুষ্ঠু অর্থনৈতিক পরিবেশ ইত্যাদি সুষ্ঠু ব্যবসা পরিচালনার জন্য প্রথম শর্ত। ব্যবসায় পরিবেশ সহায়ক না হলে ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের উন্নয়ন সম্ভব নয়।

৪.২২ সরকারি ও বেসরকারি খাতের সহযোগিতা

ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পকে শক্তিশালী করার জন্য সরকারি ও বেসরকারি খাতের পারস্পরিক সহযোগিতা অপরিহার্য। সহযোগিতা সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রস্তাব বাস্তবায়ন করা অত্যন্ত জরুরী। এর জন্য দেশের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের আন্তরিক সহযোগিতা ও সহায়তা একান্তভাবে প্রয়োজন।

৪.২৩ ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের উৎপাদন কাঠামো

ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের উৎপাদন কাঠামো বহুমুখীকরণের স্থৈতিকতা (Flexibility) থাকা বাঞ্ছনীয় ও গতিশীল হওয়া প্রয়োজন। এই শিল্পে উৎপাদন যন্ত্রপাতি অপেক্ষাকৃত ছোট সাইজের হওয়াতে অপেক্ষাকৃত অল্প খরচেই পুরানো যন্ত্রপাতি পরিবর্তন এবং নতুন যন্ত্রপাতি সংযোজন করা সম্ভব। একইভাবে শ্রমিকদের নতুন প্রযুক্তির সাথে প্রশিক্ষিত করে বহাল রাখা যাবে। অতএব বলা যায় বৃহৎ শিল্পের তুলনায় ক্ষুদ্র শিল্পে আধুনিক প্রযুক্তি দ্রুত আত্মস্থকরণ সম্ভব। তুলনামূলকভাবে ক্ষুদ্র শিল্পে উৎপাদনশীলতা বেশি। তাই এই শিল্প অভ্যন্তরীণ ও বিদেশি বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার সুযোগও বেশি।

৪.২৪ ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পে ইন্টারনেট ও ওয়েবসাইট সুবিধা

ইন্টারনেটের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের দেশ ও বিদেশের তথ্যাদি জানার জন্য বিশাল সুযোগ রয়েছে। FBCCI ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের বিভিন্ন খাতের জন্য

ওয়েবসাইট তৈরি করতে পারে। ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ের বিভিন্ন সুযোগ ও সহায়তা বহুমুখী করা যেতে পারে ইন্টারনেট ও ওয়েবসাইট সুবিধার মাধ্যমে। দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন এলাকার ব্যবসায়ক উপাত্ত বিশ্লেষণ করে ঐ সমস্ত পণ্য চিহ্নিত করা যেতে পারে, যেগুলোর ব্যবসায়িক সাফল্যের উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে। এই সমস্ত উপাত্ত ইন্টারনেট বা অন্য কোন পদ্ধতির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যবহারকারীর নিকট পৌছে দেয়া যেতে পারে। এটা অত্যন্ত জরুরীভাবে প্রয়োজন বিভিন্ন কারণে। এর ফলে আন্তর্জাতিক ওয়েবসাইটগুলোর সাথে অন লাইন সংযোগের মাধ্যমে একটি শক্ত নেটওয়ার্ক গড়ে উঠবে।

৪.২৫ ই-কমার্স

ইলেক্ট্রনিক কমার্স দেশে ও বিদেশে বিস্তার লাভ করার একটি বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে। এই পদ্ধতিতে ক্রেতার অর্ডার ও চাহিদা মোতাবেক বিক্রেতা ও পণ্যের সন্ধান করা হয়। ক্রেতা ও বিক্রেতা সম্বন্ধে এ ধরনের তথ্য বিনিময় কৃষিজাত পণ্য, চামড়াজাত পণ্য, টেক্সটাইল, ক্লথিং, তথ্য প্রযুক্তি ও ধাতব পণ্যের জন্য যেমন প্রযোজ্য তেমনি কাঁচামাল এবং মধ্যবর্তী পণ্যের জন্যও প্রযোজ্য।

৪.২৬ বোর্ড অব ইনভেষ্টমেন্ট এবং এক্সপোর্ট প্রমোশন ব্যুরোর সহায়তা

সরকারি প্রতিষ্ঠান যেমন বোর্ড অব ইনভেষ্টমেন্ট, এক্সপোর্ট প্রমোশন ব্যুরো, ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানগুলো প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পকে সাহায্য করতে পারে। তারা দেশের অভ্যন্তরে এবং দেশের বাইরে অনুষ্ঠিতব্য বিভিন্ন প্রদর্শনী ও ট্রেড ফেয়ারে অংশগ্রহণ সম্বন্ধে তথ্য ও সহায়তা এবং নিজেদের প্রদর্শনী আয়োজন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে এই ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে সাহায্য করতে পারে। তারা সম্ভাব্য বিদেশী ক্রেতা চিহ্নিত করে দেশীয় ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে সংযোগ স্থাপন করে সহায়তা করতে পারে। বিভিন্ন বিদেশি বাজারে পণ্যের চাহিদার ধারা পরিবর্তনের তথ্য এবং ব্যবসার সুযোগ সুবিধা এবং এর সন্ধান প্রক্রিয়া সংক্রান্ত পরামর্শ সেবা সম্ভবনাময় রপ্তানিকারকদেরকে প্রদান করা প্রয়োজন।

৪.২৭ ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কীমের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পকে আর্থিক সহায়তা প্রদান

ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের জন্য আর্থিক সহায়তা কার্যক্রমের সফলতা আসবে যদি দু'টি কার্যক্রম হাতে নেয়া যায়। (i) ঋণ প্রদানের জন্য একটি আলাদা প্রতিষ্ঠান (DFI)

যার শাখা সারাদেশ ব্যাপী থাকবে। শিথিল শর্তের পর্যাপ্ত পরিমাণ আর্থিক সহায়তা দেয়ার ক্ষমতা ও এখতিয়ার এই প্রতিষ্ঠানের থাকতে হবে। অন্যদিকে ঋণ পরিশোধ প্রক্রিয়ার তদারকির ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানকে দক্ষ হতেহবে। (ii) ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কীম: ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে সহায়তা দেয়ার জন্য এই ধরনের স্কীম অত্যন্ত ফলপ্রসু বিশেষত আমাদের মত দেশে যেখানে ক্ষুদ্র ঋণগ্রহিতা ঋণ গ্রহণে অনেক বাঁধার সম্মুখীন হন।

৪.২৮ বিসিককে ঢেলে সাজাতেহবে এবং বহুমুখী সেবার জন্য আলাদা প্রতিষ্ঠান স্থাপন

ক্ষুদ্র শিল্প সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠান বিসিককে ঢেলে সাজাতে হবে, যাতে এই দেশে ক্ষুদ্র শিল্পের বিকাশ ত্বরান্বিত হয়। বিকল্পভাবে, Small and Medium Enterprise Development Authority (SMEDA) নামে একটি আলাদা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা যায়, যেটা একক পরামর্শক ও সেবা কেন্দ্র (One stop consultancy & service centre) হিসাবে কাজ করবে। এই প্রতিষ্ঠানে প্রথমত ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের নীতিমালা প্রণয়নে অংশগ্রহণ ও সহায়তা প্রদান করবে; দ্বিতীয়তঃ শিল্প প্রতিষ্ঠানকে পরামর্শ, সাহায্য, সহায়তা ও সেবা প্রদান করবে। তৃতীয়তঃ এই প্রতিষ্ঠান ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের জন্য রিসোর্সের প্রধান কেন্দ্র (Resource base) হিসাবে কাজ করবে। এ ছাড়া উক্ত প্রতিষ্ঠান অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ফোরামে ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করবে। উক্ত প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রীয়, ব্যক্তি অথবা যৌথভাবে সহায়তা প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান হতে পারে।

৪.২৯ ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের নীতি কৌশল ব্যবহার বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষণ

ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের জন্য নীতি কৌশল ব্যবস্থাপত্র প্রণয়নই শেষ কথা নয়। যুগোপযোগী ও সঠিক কার্যক্রম গ্রহণ করে তা বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। নীতি কৌশল মালার কার্যক্রম কি পরিমাণ বাস্তবায়ন হয়েছে এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের উন্নয়নের জন্য তা কতটুকু ফলপ্রদ হয়েছে তা সময়ে সময়ে পরিবীক্ষণ (Monitoring) করতে হবে। উক্ত পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন (Feed Back) পাওয়া যাবে ফলে প্রয়োজনানুসারে সংশোধনী পদক্ষেপ নেয়া যাবে। এতে গৃহীত নীতিমালার কাঙ্খিত সুফল নিশ্চিত করা যাবে। তবে নীতি কৌশল বাস্তবায়ন সংক্রান্ত পরিবীক্ষণ একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে করা প্রয়োজন।

৪.৩০ বর্তমানে প্রচলিত নীতিমালা উদ্ভুত বাধাসমূহ দূরীকরণ

বাংলাদেশে বর্তমানে শিল্পনীতিমালায় কিছু কিছু দিক রয়েছে, যা পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে শিল্প বিকাশে বাধা সৃষ্টি করছে। বর্তমানের নীতিমালা অভিজ্ঞতার আলোকে পূর্ণাঙ্গভাবে পুনঃপরীক্ষা করা প্রয়োজন, যাতে নীতিমালা থেকে উদ্ভুত বাধাসমূহ চিহ্নিত করা যায় এবং ঐ বাধাসমূহ দূরীকরণের নিমিত্ত যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।

৪.৩১ উদ্যোগী প্রতিষ্ঠান ও উদ্যোক্তাদের উন্নয়নের জন্য সহায়ক নীতিমালা

সহায়ক নীতিমালা প্রণয়নে শুধুমাত্র উদ্যোক্তাদের উন্নয়নে সচেষ্ট হলেই চলবেনা, উদ্যোগী প্রতিষ্ঠানকেও এগিয়ে নিতে হবে। যেহেতু একটি উদ্যোগী প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় বহু ধরনের পরিবর্তনশীল ফ্যাক্টর (Variables) রয়েছে, অন্য খাতের নীতিমালায় যেগুলোর ইন্টারপ্রাইজ উন্নয়নে ভূমিকা রয়েছে সেগুলোও সতর্কতার সাথে বিবেচনা করা উচিত।

৪.৩২ সরকারি ও বেসরকারি খাতের অংশদারিত্বের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা এবং আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও সরকারি অংগ প্রতিষ্ঠানগুলোর অব্যবস্থা দূরীকরণ

বেশিরভাগ সরকারি অংগপ্রতিষ্ঠানগুলো (Govt. Agencies) অত্যধিক অব্যবস্থাপনা ও আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় ভুগছে যা ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প বিকাশে মোটেই উপাযোগী নয়। এগুলো ঢেলে সাজানোর প্রয়োজনীয়তা দীর্ঘদিন ধরে অনুভব করলেও কার্যত কিছুই হয়নি। যথাযথ প্রাতিষ্ঠানিক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার জন্য সরকারি অংগপ্রতিষ্ঠানগুলা ঢেলে সাজাতে হবে। এলক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর মাঝে নিহিত সহজাত শক্তিশালী দিকগুলো ব্যবহার করতে হবে। অন্যদিকে যদি কোন বাধা ও সীমাবদ্ধতা থাকে তা প্রশমন করতে হবে।

৪.৩৩ উদ্যোক্তা তৈরি ও উন্নয়ন

সামাজিক অঙ্গনে উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করতে হবে। আধুনিক বিশ্বে উদ্যোক্তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের স্থপিত বলা হয়। তাই উদ্যোক্তাদের কাজের মূল্যায়ন করতে হবে এবং তাদের অবদানের স্বীকৃতি দিতে হবে। এমনকি কোন উদ্যোক্তা

কোন প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হলে তাকে দিক নির্দেশনা, সহায়তা ও উৎসাহ দিতে হবে। এটা অত্যন্ত জরুরী কারণ উদ্যোগী প্রচেষ্টায় সবাই কৃতকার্য হয় না, শুধুমাত্র অল্পসংখ্যক তাদের প্রচেষ্টায় সাফল্যের স্বাক্ষর রাখেন।

৪.৩৪ সহায়ক অবকাঠামোগত সুবিধা

পানি, গ্যাস, টেলিফোন এবং বিদ্যুতের সংযোগ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দিতে হবে। সুষ্ঠু বিদ্যুতের সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। ট্যাক্স ও শুল্কের হার হ্রাস করে বিভিন্ন প্রকার জেনারেটরের মূল্য কমাতে হবে।

৪.৩৫ গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন ইনষ্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাকরণ

উদ্যোক্তা ও উদ্যোগী প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ এবং গবেষণার জন্য একটি আলাদা ইনষ্টিটিউট থাকা প্রয়োজন। বিশেষত আমাদের মত দেশে, যেখানে উদ্যোগী পদক্ষেপ খুব কম দেখা যায়।

৪.৩৬ আই, এস, ও ষ্ট্যান্ডার্ড ঃ পণ্যের গুণগত মান নিশ্চিতকরণ ও পরিবেশ বান্ধবতা

আন্তর্জাতিক ষ্ট্যান্ডার্ডসমূহ যেমন ISO 9000 ও ISO 14000 এর মাধ্যমে পণ্যের গুণগত মান ও পরিবেশ বান্ধবতা নিশ্চিত করতে হবে। কোয়ালিটি বা গুণগত মান হচ্ছে একটি পণ্যের বা সেবার সমস্ত বৈশিষ্ট্য ও গুনাগুন যেটা ঐ পণ্যের জ্ঞাত এবং ব্যক্ত প্রয়োজনগুলো মিটাতে পারে (ANSI/ASQC Standard A3-1987)। সংশ্লিষ্ট স্পেসিফিকেশন সামনে রেখে পণ্যের গুণগত মান গাণিতিকভাবে পরিমাপ করা যায়। এইভাবে কোয়ালিটি বা গুণগত মানের পরিমাণগত এবং কার্যকর সংজ্ঞা পাওয়া যায়।

৪.৩৭ মহিলা উদ্যোক্তা উন্নয়ন

বাংলাদেশে মহিলা উদ্যোগ ব্যাপকভাবে উৎসাহিত করতে হবে। এই দেশে মোট জনসাধারণের প্রায় ৫০% মহিলা। অথচ মহিলা উদ্যোক্তার সংখ্যা অকিঞ্চিতকর। উদ্যোগী কার্যক্রমে বৃহৎ অংশের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া কোন দেশ উন্নতি লাভ করতে পারে না। তাই উদ্যোগী প্রচেষ্টায় যাতে অধিক সংখ্যক মহিলা অংশগ্রহণ করতে পারে সে বিষয়ে নীতিমালা প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

উপসংহার

স্বল্পোন্নত বা উন্নয়নশীল দেশে শিল্প সেক্টরের উন্নয়ন ও স্থায়ীত্বের মাধ্যমে দ্রুত অর্থনৈতিক অগ্রগতি তথা দরিদ্র জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক মুক্তি অর্জন করা সম্ভব। পৃথিবীর শিল্পোন্নত বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা যায় যে, ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প ঐ সমস্ত দেশে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। বাংলাদেশের সামগ্রিক শিল্প সেক্টরের আঙ্গিকে ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প একটি সম্ভাবনাময় খাত হিসেবে চিহ্নিত করা যায় যা দেশের অর্থনৈতিক উৎকর্ষ সাধনের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এ খাতে তুলনামূলকভাবে মধ্য ও নিম্নমধ্য পর্যায়ের উদ্যোক্তাগণের পুঁজি বিকাশের অবারিত সুযোগ রয়েছে। উপার্জন ও নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং শিল্পের অগ্রগতির ক্ষেত্রে এ খাতের প্রছন্নশক্তি অর্থনৈতিক প্রবাহকে সুদৃঢ় করতে পারে। ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এ শিল্পগুলো আকার, মালিকানা স্বত্ব, ব্যবস্থাপনা কাঠামো, সামর্থ্য, প্রযুক্তির ব্যবহার ও লক্ষ্য বাজার (market focus) এর আলোকে অসমসত্ত্ব (heteroge-neity) ও ভিন্ন প্রকৃতির এবং প্রতিটি শিল্প নিজস্ব আলাদা সংজ্ঞায় সংজ্ঞায়িত যদিও তাদেরকে একই খাতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। দেশে ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের দীর্ঘস্থায়ী ও প্রতিযোগিতামূলক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে যথাযথ কৌশল ও নীতিমালার প্রচলন একটি অপরিহার্য পূর্বশর্ত। অত্র প্রবন্ধটিতে প্রয়োজনীয় নীতিমালা সংক্রান্ত একটি কাঠামো প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত নীতিমালা প্রচলন একটি অপরিহার্য পূর্বশর্ত। অত্র প্রবন্ধটিতে প্রয়োজনীয় নীতিমালা সংক্রান্ত একটি কাঠামো প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত নীতিমালা ও কৌশল পদ্ধতিগুলো প্রচলনের জন্য স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে প্রথম করণীয় হচ্ছে প্রতিটি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে যে প্রতিযোগিতামূলক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে সজাগ থাকা। পরবর্তী করণীয় হচ্ছে উক্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য নিজেকে তৈরী করা। বিশ্বায়নের পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে ২০০৫ সালের পর থেকে বৃহৎ আঙ্গিকে প্রতিটি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে নতুন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হবে। মুক্ত বাজার প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য পণ্যের মূল্য হ্রাস, গুণাগুণ বৃদ্ধি, সময়মাফিক পণ্য সরবরাহ ইত্যাদি বিষয়ে সর্বোচ্চ দৃষ্টি দেয়া অপরিহার্য। প্রকৌশল শিল্পের বিকাশ নিশ্চিত করতে হলে তাত্ত্বিক ও প্রয়োগিক জ্ঞানের সমন্বয় ঘটিয়ে কারিগরি দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে বাজারে শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিতে হবে।

তথ্য নির্দেশিকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (২০০১), ***বাংলাদেশ অর্থনৈতিক জরিপ, ২০০১,*** অর্থ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (১৯৯৯), ***শিল্পনীতি, ১৯৯৯,*** শিল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (১৯৯২), ***MIS রিপোর্ট, অভ্যন্তরীণ ডকুমেন্ট, অর্থ বিভাগ, বিসিক,*** ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (১৯৯১), ***শিল্পনীতি, ১৯৯৯,*** শিল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (১৯৮৬), ***শিল্পনীতি, ১৯৮৬,*** শিল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

ISSN 1605-2021

লোকপ্রশাসন সাময়িকী
একবিংশতিতম সংখ্যা,
ডিসেম্বর ২০০১, পৌষ ১৪০৮

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে গণপ্রতিনিধি এবং জন-প্রশাসনের সম্পর্ক ঃ বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিতে

অধ্যাপক মোঃ আলী আশরাফ *
আইরিন পারভিন **

Relationship between Public Representatives (Parliament) and Public administration in Democratic State

-Professor Md. Ali Ashraf
-Aren Parvin

Abstract : Democracy is the government of the people, by the people and for the people. In a democratic country public representatives (parliament) and public administration both are playing important roles for the welfare of the people. The people elect government or representatives of the people for a specific period. On the other hand the posts of the public Administrators are permanent. Co-ordination and responsiveness between these two groups are essential for smooth running of Democracy. This paper wants to identify the roles of the public representatives and the public Administrators and give some recommendations for Serving the welfare of the people.

ভূমিকা :

মানব সভ্যতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান হচ্ছে গণতন্ত্র। পাশ্চাত্যে এর সূচনা হলেও বর্তমানে পৃথিবীর সর্বত্রই এর বিকাশ ঘটেছে। বর্তমানে গণতন্ত্রের বিকাশ কেবল রাষ্ট্র পরিচালনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই বরং মানব সভ্যতার সামাজিক, সাংগঠনিক প্রক্রিয়ায় ও গণতন্ত্রের প্রয়োগ আমরা দেখতে পাই। গণতেন্ত্রর মাধ্যমে মানুষ তথা জনগণ তার নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারে যথার্থ অর্থে জনগণের মধ্য থেকে এবং জনগণের দ্বারা জনগণের জন্যে সরকারই হচ্ছে গণতান্ত্রিক সরকার। গণতন্ত্র

* সাবেক ডেপুটি স্পীকার, বাংলাদেশ পার্লামেন্ট। প্রভাষক, উণ্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

** প্রভাষক, উণ্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

ভাল কি মন্দ এ তুলনায় গেলে এর ভাল দিকটিই বেশী সমাদৃত হয়। গণতন্ত্রের প্রতি মানুষের আকর্ষণের অনেক কারণ আছে। গণতন্ত্র শাসন কাঠামোতে জন মানুষের স্থান আছে এবং তাদের প্রতিনিধিত্বের বক্তব্য আছে। শাসিতের নিকট শাসক শ্রেণী দায়িত্বশীল, সংবেদনশীল ও দায়বদ্ধ থাকে। তাতে আইনের শাসন, ব্যক্তি স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি থাকে।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা ঃ

রাষ্ট্র-পরিচালনায় গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সরকার গঠনের দু'টি পদ্ধতি চালু রয়েছেঃ

১। রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার (Presidential Form of Government): যেমন- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, শ্রীলঙ্কা। রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থায় রাষ্ট্র-পরিচালনার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত থাকলেও সেখানে জনগণের নির্বাচিত আইন সভার ভূমিকা অনেক সুদৃঢ় এবং কার্যকর। এ ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি এবং তাঁর মন্ত্রীপরিষদকে নির্বাচিত জন-প্রতিনিধিদের নিকট জবাবদিহি করতে হয় এবং জন-প্রতিনিধিদেরকেও জনগণের নিকট জবাবদিহি করতে হয়। রাষ্ট্রপতি শাসিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্বাচিত আইন সভার পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন নাম রয়েছে।

২। সংসদীয় গণতন্ত্র (Parliamentary Form of Government) ঃ যুক্তরাজ্য, ভারত, বাংলাদেশ, জাপান সহ পৃথিবীর আরও অনেক দেশে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রয়োগে সরকারের পন্থা সুনির্দিষ্ট এবং সংবিধান কর্তৃক সুনিয়ন্ত্রিত। রাষ্ট্র পরিচালনার নির্বাহী কর্তৃত্ব ন্যস্ত থাকে মন্ত্রী পরিষদের উপর এবং মন্ত্রী পরিষদের সদস্যগণ সরকারের নীতি এবং কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য ব্যক্তিগতভাবে এবং যৌথভাবে দায়ী থাকে সংসদের নিকট এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে দায়ী থাকে জনগণের নিকট। জন-প্রতিনিধিগণ তাদের দায়িত্ব পালনে সরাসরি দায়ী থাকে জনগণের নিকট। জনগণের নিকট সরাসরি জবাবদিহিতার এ ব্যবস্থার জন্য সংসদীয় গণতন্ত্র বর্তমান বিশ্বে অত্যন্ত জনপ্রিয়। সংসদীয় ব্যবস্থায় সরকারের কর্মকান্ডের সামগ্রিক কেন্দ্রবিন্দু হল সংসদ। এ ব্যবস্থায় রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুও সংসদ। তবে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত আইন সভার নিকট নির্বাহী বিভাগকে সরাসরি এবং সামষ্টিকভাবে দায়বদ্ধ রাখার বিধান সংসদীয় ব্যবস্থারই একক এবং অনন্য বৈশিষ্ট্য। এই ব্যবস্থায় সরকারি নীতি নির্ধারিত হয় সংসদে এবং তা বাস্তবায়নে মন্ত্রীপরিষদ সংসদের নিকট দায়ী থেকে কর্তৃত্ব প্রয়োগ করে থাকেন। সংসদ প্রসঙ্গে তাই Lioyd George বলেন, "The house is the sounding board of the nation; it both speakes for and speaks to the people"

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক কর্তৃত্বের মতো প্রশাসনিক কর্তৃত্বের উৎসও হল সংসদ। ১৯৮১ সালে আমেরিকার সিনেট কমিটির এক রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিভাগ এবং বিভাগীয় কর্মকর্তারা কোন অর্থেই প্রশাসনিক কর্তৃত্বের অধিকারী নয়; তারা কংগ্রেস প্রণীত আইনের সৃষ্টি (They are the creatures of the laws of Congress)। জাতীয় অর্থের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠাকল্পে গ্লাডষ্টোনের (Gladstone) নেতৃত্বে কমন্স সভায় ১৮৬২ সালে যে আইন প্রণীত হয় তারও মূল লক্ষ্য ছিল প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের ক্ষমতা সংসদের আইন থেকে উদ্ভুত। তখন থেকেই গণতান্ত্রিক বিশ্বে প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানেও এ সুর পরিলক্ষিত হয়। সংবিধানের ১৩৩ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "এই সংবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে সংসদ আইনের দ্বারা প্রজাতন্ত্রের কর্মে কর্মচারীদের নিয়োগ ও কর্মের শর্তাবলী নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবেন"[১]। এখানেও প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তাদের নিয়োগ এবং তাদের কর্মের শর্তাবলী নির্ধারণের দায়িত্ব সংসদের উপর ন্যস্ত।

গণতন্ত্রের প্রকৃত শাসন হল আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় আইন/নীতি প্রণীত হয় সংসদে এবং তা বাস্তবায়নের দায়িত্ব থাকে জন-প্রশাসনের উপর। নীতি প্রণয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ, সমন্বয় এবং সরবরাহ করে থাকেন প্রশাসকগণ। অন্য কোন বিকল্প থাকলে তাও জন-প্রশাসকগণ তুলে ধরেন। মাঠ পর্যায়ে এ সকল নীতিমালা বাস্তবায়ন করেন জন-প্রশাসকগণ।

এখানে লক্ষণীয় যে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সংসদ যেহেতু দলীয় সেহেতু নীতি নির্ধারিত হয়ে থাকে দলীয় দৃষ্টিকোণ থেকে কিন্তু তার প্রয়োগকারীগণ অর্থাৎ প্রশাসকগণ থাকেন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। তাই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন কার্যকর সংসদ (Legislature)এবং দক্ষ ও নির্দলীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা। সরকারের জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত করণের জন্যও প্রয়োজন কার্যকর সংসদ এবং দক্ষ ও নির্দলীয় প্রশাসন ব্যবস্থা। একটির অভাবে অন্যটির কার্যক্রম কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌছাতে পারবেনা। সরকারি কর্মকান্ড বাস্তবায়নে চাই এ দুয়ের মধ্যে সমন্বয় এবং সু-সম্পর্ক যা আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে হবে। বাংলাদেশের মত সীমিত সম্পদের দেশে সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করণের মাধ্যমে জনগণের ভাগ্য-উন্নয়নের জন্য এর প্রয়োজন আরো বেশী।

---

১. বাংলাদেশ সংবিধান, পৃষ্ঠা-১০৯

বাংলাদেশে গণতন্ত্রের বিকাশ ঃ

দীর্ঘ রক্তাক্ত সংগ্রামের পর ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীনতা লাভের সূচনা লগ্নে ১৯৭২ সালের ১৪ই এপ্রিল নির্বাচিত গণপরিষদে গৃহীত হয় বাংলাদেশের সংবিধান, আর ১৯৭২ সালের সাময়িক সাংবিধানিক আদেশ (Provisional Constitutional Ordinance, 1972) বলে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হয় সংসদীয় গণতন্ত্র। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর স্বাধীনতা লাভের সূচনাতেই সংবিধান এবং সংসদীয় গণতন্ত্র লাভের এরূপ দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। বাংলাদেশের ১৯৭২ সালের সংবিধানকে অত্যন্ত যুগোপযোগী এবং শ্রেষ্ঠ সংবিধান সমূহের একটি বলে আখ্যায়িত করা হয়। এ সংবিধানের মূল বক্তব্যই হচেছ সংসদীয় গণতন্ত্র। প্রাপ্ত বয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত জাতীয় সংসদ এবং জাতীয় সংসদের নিকট দায়ী মন্ত্রীপরিষদ-এটাই হচ্ছে সংবিধানের মূল বক্তব্য।

১৯৭২ এর সংবিধানে রাজনৈতিক কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দু চিহ্নিত করা হয় সংসদকে এবং সংসদীয় স্থায়ী কমিটি সৃষ্টির মাধ্যমে মন্ত্রণালয়/বিভাগ সমূহের প্রশাসনিক কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব ন্যস্ত হয় এ সংসদের উপর।

বাংলাদেশের ১৯৭২ সালে গণতান্ত্রিক চর্চা শুরু হলেও তা ব্যাহত হয় অল্পকিছু দিনের মধ্যেই। গণতন্ত্রমনা এ দেশের জনগণের দুর্বার আন্দোলনের প্রেক্ষিতে ১৯৯০ সালে পতন ঘটে স্বৈরাচার সরকারের। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে নিরপেক্ষ সরকারের তত্ত্বাবধানে ১৯৯১ সালের ২৭ শে ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত হয় অবাধ সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন। নির্বাচিত জাতীয় সংসদে ১৯৯১ সনের ৬ই আগষ্ট সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় দ্বাদশ সংশোধন আইন এবং ১৯৯১ সনের ১৯শে সেপ্টেম্বর থেকে বাংলাদেশে আবারও প্রতিষ্ঠিত হয় সংসদীয় গণতন্ত্র। জনগণের সঠিক ইচ্ছার প্রতিফলনই হচ্ছে সরকারি ও বিরোধী দলের ঐক্যমতের ভিত্তিতে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ফসল। গণতন্ত্রমনা বাংলাদেশের মানুষ ইতিপূর্বে ১৯৫৪ সালে ও ১৯৭০ সালের নির্বাচনেও গণতান্ত্রিক সরকারের পক্ষে রায় দিয়েছিল।

প্রশাসনিক ব্যবস্থা ঃ

মানব সভ্যতার প্রাচীনতম শাসন পদ্ধতির অন্যতম হল আমলাতন্ত্র (Bureaucracy)। সরকারের কর্মকান্ড পরিচালনার অন্যতম অঙ্গ হল আমলাতন্ত্র। প্রাচীন এ পদ্ধতি সময়ের সাথে পরিবর্তিত হয়ে বর্তমান বিশ্বে সর্বত্রই প্রচলিত আছে। Maxweber

তাঁর Hydraulic state গবেষণায় উল্লেখ করেন যে, well organised centralised bureaucracies well in place in ancient India and China[২]। রাজা অশোক-এর আমলে সুশৃঙ্খল কেন্দ্রীয় আমলাতন্ত্র ভারতে এবং মেন্ডারিনের আমলে চীনে পরিলক্ষিত হয়। সরকারের নীতি বাস্তবায়নে আমলাতন্ত্র (Bureaucracy) প্রধান ভূমিকা পালন করে থাকে। বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নে আমলাতন্ত্রের ভূমিকা আরো বেশী। একটি টিপিকাল (Typical) উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে বাংলাদেশের উন্নয়ন কর্মকান্ডে আমরা প্রশাসনের নিরবচ্ছিন্ন ভূমিকা দেখতে পাই। বাংলাদেশে যে প্রশাসনিক ব্যবস্থা বিদ্যমান তা মূলতঃ বৃটিশ উপনিবেশ আমলে বৃটিশরা যে প্রশাসনিক ব্যবস্থা চালু করেছিল তারই উত্তর সূত্রে প্রাপ্ত প্রশাসনিক ব্যবস্থা। বৃটিশরা এদেশ শাসনের জন্য যে প্রশাসনিক ব্যবস্থা স্থাপন করে পরবর্তীতে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পরও পাকিস্তানি সরকার কর্তৃক তা চলতে থাকে। ১৯৪৭ এর পরবর্তী সময়ে তৎকালীন পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু না হওয়ার কারণে, দেশের প্রধান নির্বাহীর ইচ্ছানুযায়ী প্রশাসকগণ কাজ করতেন। বৃটিশ শাসনামলে তাই আই, সি, এস, (ICS) অফিসাররা স্থানীয় মন্ত্রীদের উপর মর্যাদা পেতেন এবং পাকিস্তান আমলেও আমরা দেখতে পাই যে Warrant of Precedence-এ সংসদ সদস্যদের অবস্থান ছিল যুগ্ম সচিবের সমপর্যায়ে। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর নির্বাচিত জন প্রতিনিধিদের পদমর্যাদা সচিবদের উপর নির্ধারিত হয়। সংসদ সদস্যদের মেয়াদ খন্ডকালীন এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থা স্থায়ী বলে উন্নয়ন কর্মকান্ডে প্রশাসকগণই মূল ভূমিকা পালন করে আসছে। প্রশাসকদের অবস্থান এবং স্থায়ীত্বের কারণে মাঠ পর্যায়ে জনগণ প্রশাসকদেরই সরকার মনে করে থাকে। তাই সচরাচর রাজনীতিবিদ, গবেষক, বিভিন্ন পেশাজীবী গ্রুপ আমলাতন্ত্রকে সমালোচনা করে থাকলেও আজ পর্যন্ত এর কোন বিকল্প ব্যবস্থা সৃষ্টি করতে পারেনি। প্রকৃত পক্ষে আমলাতন্ত্রের কোন বিকল্পের প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন আমলাতন্ত্রকে জনগণের কল্যাণে কাজে লাগানো। এর জন্য চাই সংসদ এবং আমলাতন্ত্রের মধ্যে সমন্বয়। বাংলাদেশ সংবিধানের ৫৫ (৬) ধারা বলে ১৯৭৫ সালে যে রুলস অব বিজনেস (Rules of Business, 1975) প্রণীত হয়েছিল তাতে মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকান্ডের প্রধান নির্বাহী ছিল সচিবগণ এবং সবিচগণ ছিলেন মন্ত্রণালয়ের প্রধান জবাবদিহিকারী কর্মকর্তা (Principal Accounting officer)। ১৯৯৬ সালে রুলস

2. Journal of Administration and Diplomacy, P-9

অব বিজনেস পরিবর্তন করে মন্ত্রীদের মন্ত্রণালয়ের প্রধান নির্বাহী করা হলেও সচিবগণ এখনও Principal Accounting officer হিসাবে বহাল আছেন।

গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বিকাশের পূর্ব শর্ত হচ্ছে দক্ষ প্রশাসনিক ব্যবস্থা। বৃটিশ শাসন আমল থেকে পাকিস্তান আমল এবং বাংলাদেশে ১৯৭৫ পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন দফায় এদেশে স্বৈরশাসন পরিচালনার কারণে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বিকাশ লাভ করতে পারেনি। উপরন্তু আমলা এবং রাজনৈতিকদের মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস সৃষ্টি হয়েছে। পক্ষান্তরে যুক্তরাজ্য, ভারত, মালয়েশিয়ার মত দেশে দীর্ঘ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া চালু থাকার কারণে পরস্পরের মধ্যে শ্রদ্ধাবোধ এবং বিশ্বাস সৃষ্টি হয়েছে।

উপরোক্ত আলোচনা হতে এটাই স্পষ্ট যে, প্রশাসকগণ তাদের অবস্থান, স্থায়ীত্ব এবং ধারাবাহিকতার কারণে উন্নয়ন কর্মকান্ডে মূল ভূমিকা পালন করে আসছেন। বিগত বছরগুলোতে এদেশে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার বিকাশ না হওয়াতে উন্নয়ন কর্মকান্ডে সংসদের ভূমিকা ছিল অতি গৌণ। তাই বর্তমানে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় চাই সংসদ এবং প্রশাসনের মধ্যে সমন্বয়।

গণতান্ত্রিক প্রশাসনে সিভিল সার্ভিসের ভূমিকা ঃ

সরকার ও প্রশাসন হচ্ছে ওতপ্রোতভাবে জড়িত দুইটি প্রত্যয়। সরকারের যিনি প্রধান, প্রশাসনেরও প্রধান তিনি। যাঁদের নিয়ে গঠিত হয় সরকার তাঁরাই নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন প্রশাসন।

রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি পদ্ধতি নির্ধারণে, কর্মসূচি প্রণয়নে মন্ত্রিসভা ও তার প্রশাসন যখন সংবিধানের অধীনে, সংসদের নিয়ন্ত্রণে আর আইনের আওতায় থেকে কার্যক্রম পরিচালনা করে তখন গণতান্ত্রিকতা প্রতিষ্ঠানিক রূপ পায় এবং কার্যকর স্থায়িত্ব অর্জন করে। বস্তুতঃ প্রশাসনিক জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্টব্যবস্থা ও শাসন পদ্ধতির অন্যতম মৌলিক উপাদান। যদিও জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতার এই ধারণার সাথে সিভিল সার্ভিসের কর্মকান্ডের সরাসরি সম্পৃক্তি নেই, তবুও সুষ্ঠু ও দক্ষ প্রশাসনের হাতিয়ার হি.সবে সিভিল সার্ভিসকে প্রশাসিনক জবাবদিহিতা আর স্বচ্ছতায় থেকেই কাজ করতে হয়। আর এখানেই সিভিল সার্ভিসের দায়বদ্ধতা। কেননা, সিভিল সার্ভিসের দায়িত্ব হচ্ছে সরকারের তথা প্রশাসনের নীতি পদ্ধতি ও

কর্মসূচি বাস্তবায়নে সহায়তা করা। সরকারকে নীতি প্রণয়ন, কর্মসূচি নির্ধারণে পরামর্শ প্রদান, সহায়তা করা সিভিল সার্ভিসের দায়িত্ব। সিভিল সার্ভিস পরিচালিত হয় আইনের অধীনে মন্ত্রিসভা তথা সরকারের নিয়ন্ত্রণে।

আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সিভিল সার্ভিসের অস্তিত্ব অপরিহার্য ও অনিবার্য। সিভিল সার্ভিসের অবর্তমানে কোন কার্যকর ও দক্ষ প্রশাসন ব্যবস্থা কল্পনা করা যায় না। এ কথা মেনে নিয়েই বলতে হয় যে, সিভিল সার্ভিস যখন সহায়ক ভূমিকার ওপরে অধিকতর অবস্থান দাবী করে বা নিজ অবস্থানের বাইরে গিয়ে কাজ করতে চায় তখন তা কর্তৃত্ব পরায়ণ হয়ে উঠে এবং প্রশাসনের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা ক্ষুন্ন হয়। রাজনৈতিক নেতৃত্ব যখন দুর্বল অথবা স্বেচ্ছাচারী অথবা জনপ্রতিনিধিদের ভূমিকা গৌণ হয়ে উঠে, তখনই এমনটি ঘটে থাকে। অন্যভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, রাজনৈতিক নেতৃত্ব যখন সামগ্রিকতার বিপরীতে গোষ্ঠীতান্ত্রিকতায়, আইনের বিপরীতে স্বেচ্ছাচারিতায় অভ্যস্ত হয়ে উঠে তখনই সিভিল সার্ভিস নিজ সীমা অতিক্রম করে প্রশাসনের কর্তৃত্বে চলে আসে। সিভিল সার্ভিস যখন এমনিতর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় তখন কার্যতঃ গণতান্ত্রিকতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, আইনের শা-ন আর রাজনৈতিক কর্তৃত্ব নিজ নিজ ভূমিকা থেকে অপসৃত হয়ে যায়। সিভিল সার্ভিসের কর্তাব্যক্তিরা হয়ে উঠে দুর্বিণীত ও দূরাচারী। আর এ কারণেই সিভিল সার্ভিস এবং তার পরিচালক সরকারকে সিভিল সার্ভিসের দায়িত্ব, কর্তব্য, দায়বদ্ধতা আর সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে, অবহিত থাকতে হবে।

সিভিল সার্ভিসে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ যেহেতু প্রশাসন ব্যবস্থার খুঁটিনাটি সম্পর্কে অবহিত এবং সার্ভিসের স্থায়িত্বের কারণে প্রশাসনকে নিয়ন্ত্রণ করার অধিকতর সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছেন সেহেতু প্রায়শঃই তাঁরা প্রশাসনকে নিয়ন্ত্রণ করতে সচেষ্ট হয়ে উঠেন। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, জনকল্যাণমুখী কর্মসূচি, প্রশাসন ও উন্নয়ন কর্মকান্ডে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ এবং সামগ্রিকভাবে প্রশাসনিক দক্ষতাই সিভিল সার্ভিসকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম।

প্রশাসনের উ-র সংসদের কর্তৃত্ব ঃ

গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সাংসদগণ নিম্নে বর্ণিতভাবে প্রশাসনিক কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন ঃ

১। মন্ত্রীগণের স্ব স্ব মন্ত্রণালয়ের প্রধান নির্বাহী হিসেবে মন্ত্রণালয়ের যাবতীয় কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণ করা এবং তাঁদের কার্যের জন্য সংসদের নিকট এককভাবে দায়ী থাকা।

২। সংসদীয় কমিটির মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণ। সরকারের বিভিন্ন বিভাগের কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণের জন্য বাংলাদেশ সংবিধানের ৭৬ (১) ধারায় সংসদ সদস্য সমন্বয়ে কমিটি গঠনের বিধান রাখা হয়েছে। বর্তানে সরকারি হিসাব কমিটি, বিশেষ অধিকার কমিটি ইত্যাদি ছাড়াও প্রত্যেকটি মন্ত্রণালয়ের জন্য একটি করে সংসদীয় স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়েছে। সরকা ের স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিগত সরকার এর আমল থেকে মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীদের পরিবর্তে সংসদ সদস্যদের এ সকল স্থায়ী কমিটিতে সভাপতি নিয়োগের বিধান করা হয়েছে। সংবিধানের ৭৬ (২ ও ৩) তে এসকল কমিটির কার্যাবলী নির্ধারণ করা হয়েছে, যেমনঃ-

ক. খসড়া বিল ও অন্যান্য আইনগত প্রস্তাব পরীক্ষা করতে পারবেন;

খ. আইনের বলবৎ করণ পর্যালোচনা এবং অনুরূপ বলবৎ করণের জন্য ব্যবস্থাদি গ্রহণের প্রস্তাব করতে পারবেন;

গ. জনগুরুত্বসম্পন্ন কোন বিষয় সম্পর্কে সংসদ কমিটিকে অবহিত করলে সেই বিষয়ে কোন মন্ত্রণালয়ের কার্য বা প্রশাসন সম্বন্ধে অনুসন্ধান বা তদন্ত করতে পারবেন এবং কোন মন্ত্রণালয়ের নিকট থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি সংগ্রহের এবং প্রশ্নাদির মৌখিক বা লিখিত উত্তর লাভের ব্যবস্থা করতে পারবেন;

ঘ. সংসদ কর্তৃক অর্পিত যে কোন দায়িত্ব পালন করতে পারবেন।

৩। সংসদ আইনের দ্বারা এই অনুচ্ছেদের অধীন নিযুক্ত কমিটিসমূহকে

ক. সাক্ষীদের হাজিরা বলবৎ করবার এবং শপথ, ঘোষণা বা অন্য কোন উপায়ের অধীনে তাঁদের সাক্ষ্য গ্রহণের;

খ. দলিলপত্র দাখিল করতে বাধ্য করবার ক্ষমতা প্রদান করতে পারবেন।

(১) নবগঠিত এসকল কমিটিগুলোর কাজের ব্যাপ্তি অনেক বিস্তৃত হলেও কমিটিগুলোতে কোন প্রফেশনাল (Pofessional) লোকবল বা লজিস্টিক সাপোর্ট দেয়া হয়নি। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বিকাশে এবং সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে এসকল কমিটিগুলোকে আরো বেশী সংগঠিত করা প্রয়োজন। কেননা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় কমিটি প্রথা হল অন্যতম পদ্ধতি যা দিয়ে সংসদ প্রশাসনিক কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। মন্ত্রণালয়ের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় মন্ত্রীদের নিয়ন্ত্রণ স্থাপনে মন্ত্রীদের Principal Accounting officer নিয়োগ করা প্রয়োজন।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জন-প্রতিনিধি ও জনপ্রশাসকের সম্পর্কের ভারসাম্য রক্ষা করা একান্ত বিবেচ্য। রাজনৈতিক নেতৃত্বাধীন জনপ্রশাসকরা আনুগত্যশীল হবেন এটাই স্বাভাবিক। এ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক নেতৃত্বের সুনির্দিষ্ট যোগ্যতার পরিচয় প্রদান একান্তভাবে আবশ্যক। কারণ জনপ্রতিনিধিগণ ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণে অস্থায়ী এবং জনপ্রশাসকগণের পদ স্থায়ী। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়-বৃটিশ পার্লামেন্টের ঐতিহ্য এক্ষেত্রে যথেষ্ঠ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হলে জনপ্রতিনিধি ও জন প্রশাসকদের ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষা হয়। রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হলে স্বেচ্ছাচারিতা থাকে না, এই জন্যে বিশ্বের অধিকাংশ গণতান্ত্রিক দেশে আইন সভা কর্তৃক বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সভাপতি স্থায়ী কমিটির আইন সভার পক্ষে কার্যপরিচালনার জন্য নির্বাচিত হয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে সরকারের জন-প্রতিনিধি ও জন-প্রশাসকগণ নিয়ন্ত্রিত থাকেন। অনেক গণতান্ত্রিক দেশে ন্যায়পাল (Ombudsman) প্রতিষ্ঠা বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। ন্যায়পাল হলো সাংবিধানিক সংসদীয় কার্যালয় যা সরকারি প্রশাসন কর্তৃক জনগণের বিরুদ্ধে কৃত অন্যায় অসুবিধার বিরুদ্ধে আইন সভা থেকে জনগণের পক্ষে এ সব অনিয়ম প্রতিকারের দায়িত্ব পালন করে। বাংলাদেশের সংবিধানেও এ বিধান রাখা হয়েছে (৭৭)।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জন-প্রতিনিধি ও জন-প্রশাসকের সু-সম্পর্কের উপর নির্ভর করে সমস্ত জনগোষ্ঠীর ভবিষ্যৎ। পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও সম্মানের ভিত্তিতেই এ

সম্পর্ক গড়ে উঠা সম্ভব। দেশ ও দেশের জনগণ সবকিছুর উর্ধ্বে এ ধারণা থেকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় মানুষের জন্যে কার্যকর প্রশাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও অর্থনৈতিক উন্নতি নিশ্চিত করা যেতে পারে। জন-প্রতিনিধিদের চিন্তা-চেতনার ফসল থেকে সৃষ্ট নীতি সমূহ বাস্তবায়িত হয় জন-প্রশাসকদের দ্বারা; সেক্ষেত্রে জনপ্রতিনিধি ও জন-প্রশাসকের মূল লক্ষ্য দেশ ও মানুষের কল্যাণ। এ প্রয়াসকে সামনে রেখেই জন-প্রতিনিধি ও জন-প্রশাসকদের ভূমিকা কার্যকর করাই দেশ ও মানুষের জন্য কল্যাণকর।

উপসংহার ঃ

গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় চাই কার্যকর সংসদ এবং দক্ষ প্রশাসনিক ব্যবস্থা। গণপ্রতিনিধিগণ সংসদে আইন প্রণয়ন করে থাকেন আর জন প্রশাসকগণ আইন প্রণয়নের লক্ষ্যে যাবতীয় তথ্যাদি উপস্থাপন এবং মাঠ পর্যায়ে সরকারি নীতি বাস্তবায়ন করে থাকেন। অন্যদিকে সাংসদগণ কমিটির মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। যা সরকারের নীতি বাস্তবায়নে একমাত্র সফল জন-প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার গঠনে সহায়ক হতে পারে আর দক্ষ জন-প্রশাসন ছাড়া গণতন্ত্রের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ সম্ভব নয়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থাই একমাত্র জন-প্রতিনিধিদের ও জন-প্রশাসকদের কর্মকান্ডের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে পারে সবচেয়ে সুদৃঢ়ভাবে। তাই আজকের পরিবর্তিত বিশ্ব আংগিকের প্রেক্ষিতে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থার উপরই সবচেয়ে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। আর একবিংশ শতাব্দির বড় চ্যালেঞ্জ হবে মানুষের সৃজনশীলতার প্রতিযোগিতা, মানুষের মৌলিক অধিকারের প্রশ্নটি আজ বিশ্ব পরিমন্ডলে স্থান পাচ্ছে গভীর গুরুত্ব সহকারে। সেজন্যই বিশ্বের কোন দেশে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হলে, বিশ্ব বিবেককে সোচ্চার হতে দেখা যায়।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থাই জন-প্রতিনিধি ও জন-প্রশাসকগণের সুষ্ঠু সমন্বয় সাধন করে মানুষের কল্যাণ বয়ে আনতে পারে। তাই প্রয়াত মার্কিন প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থাকে সঠিক ভাবেই সংজ্ঞায়িত করেছেন, Democracy is the Government of the People, by the People and for the People. জন প্রতিনিধি ও জন-প্রশাসনের সঠিক কর্মকান্ড এবং তাদের সুষ্ঠু সমন্বয়ই অধিকতর কল্যাণ নিশ্চিত করতে পারে।

তথ্য নির্দেশিকা

Ahamed E (1981), ***Development Administration Bangladesh***, Dhaka, Centre for Administration studies.

আহমদ এ (১৯৯২) ***গণতন্ত্র ও রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা ঃ বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রাসঙ্গিক চিন্তা ভাবনা,*** অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমদ সম্পাদিত, ঢাকা-১-১২।

The Constitution of the Peoples, Republic of Bangladesh (as modified up to 30th April, 1996) Government of the peoples Republic of Bangladesh Ministry of Law & Parliamentary Affairs.

Griffith J,A,G, Ryle. M & wheeler Booth M,A,J (1989) ***Parliament-Function, Practice of Procedure,*** London, Sweet of Maxwell,

Haque M, M (1993) ***Roles of Administrative Service in Democratic State.*** Journal of Administration and Diplomacy, Bangladesh Civil Service (Administration) Academy Dhaka. 9-17.

হাসান উজ্জামান (১৯৯২) ***বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্রের পুনঃ প্রবর্তন ঃ উত্থাপিত ভাবনা ও প্রশ্নাদি,*** বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্র প্রাসঙ্গিক চিন্তা-ভাবনা, অধ্যাপক এমজাউদ্দিন আহমদ সম্পাদিত, ঢাকা-৪৪-৬৬।

খান ম, ম (১৯৯২) ***বাংলাদেশে প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের জবাবদিহির ব্যবস্থা,*** বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রাসঙ্গিক চিন্তা-বাবনা, অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমদ সম্পাদিত, ঢাকা ১০০-১০৭।

মিল জে এস (১৯৬৯) ***গণতান্ত্রিক সরকার*** (দরবেশ আলী খান অনূদিত) বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

রহমান (১৯৯২) ***সংসদীয় গণতন্ত্র ও সরকারের দায়িত্বশীলতা,*** বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রাসঙ্গিক চিন্তা-ভাবনা, অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমদ সম্পাদিত, ঢাকা-৬৭-৮৪।

Rondinelli D. A (1990), ***Development Projects as Policy Experiment,*** London, and Routledge.

Rules of Business (1975), Cabinet Division Government of the Peoples Republic of Bangladesh.

Rules of Business (1996), Cabinet division Government of the Peoples Republic of Bangladesh.

Sharkansky. 1(1975), ***Public Administration : Policy Making in Government Agencies.*** Chicago, Rand Mannerly College Publishing Company.

The World Bank (1996), ***বাংলাদেশ একটি দক্ষ সরকারের রূপরেখা সরকারী খাতের সংস্কার,*** ঢাকা ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড।

ISSN 1605-2021

লোকপ্রশাসন সাময়িকী
একবিংশতিতম সংখ্যা,
ডিসেম্বর ২০০১, পৌষ ১৪০৮

বাংলাদেশে দারিদ্রের গতি-প্রকৃতি এবং দারিদ্র বিমোচনে গৃহীত সরকারি ও বেসরকারি কার্যক্রম

আ, ক, ম, মাহবুবুজ্জামান *

Trends of Poverty in Bangladesh and Efforts of Government and Non-Government to Alleviate Poverty

-A K M Mahbubuzzaman

Abstract : Poverty is an important and major problem of Bangladesh. Government is actively considering and taking steps to reduce the magnitude of poverty. In this article types of poverty including poverty cycle, scenario of poverty in Bangladesh, trends of poverty, programmes for poverty alleviation by government and non-government and suggested measures have been discussed followed by conclusion.

ভূমিকা

বাংলাদেশ পৃথিবীর দরিদ্র দেশসমূহের মধ্যে অন্যতম একটি দেশ। প্রায় ১৩.৪ কোটি (শুমারী, ২০০১) মানব সমৃদ্ধ ১,৪৪,০০০ বর্গ কিলোমিটারের এই দেশটি জর্জরিত বিভিন্ন সমস্যায়, দারিদ্র তার মধ্যে অন্যতম। মৌলিক চাহিদা পূরণ হচ্ছে না প্রায় অর্ধেক জন গোষ্ঠীর। উপরন্তু, প্রাকৃতিক ও মানব-সৃষ্ট দুর্যোগে বিপর্যস্ত হচ্ছে বার বার। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা প্রাপ্তির ৩০ বছর পরেও দারিদ্রের বিবেচনায় পৃথিবীর ৫ম দরিদ্রতম দেশ হিসেবে আজও পরিগণিত। ২০০১ সালে এর মাথা-পিছু বার্ষিক আয় ৩৯০ মার্কিন ডলার মাত্র (অর্থ মন্ত্রণালয়-২০০১), যেখানে সুইজারল্যান্ডের অধিবাসীদের মাথাপিছু বার্ষিক আয় ৩৪,৬২০ মার্কিন ডলার।

---

* সহকারী অধ্যাপক, সমাজকর্ম বিভাগ, শাবিপ্রবি, সিলেট ও পিএইচ.ডি. ফেলো, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

বাংলাদেশের বর্তমান মাথা-পিছু বার্ষিক আয়কে যদি মাসিক আয়ে বিভক্ত করা হয়, তবে তা হবে ৩২.৫০ মার্কিন ডলার, টাকার অংকে বর্তমান বাজার মূল্যে প্রায় ১,৮৫২ টাকা। বর্তমান বাজার মূল্যে এই টাকায় একজন ব্যক্তির মৌলিক চাহিদাসমূহ পূরণ করা প্রায় অসম্ভব। কিন্তু তার চেয়েও বড় সমস্যা হচ্ছে, এই গড় আয় নিরূপিত হচ্ছে স্বল্প সংখ্যক কোটিপতি এবং অধিক সংখ্যক স্বল্পবিত্ত ও নিঃস্ব মানুষের আয়ের যোগফলের গড়ে। সুতরাং বিশাল জনগোষ্ঠীর (৪০.৫৬%) গড় মাসিক আয় ৫০০ টাকার নিচে (বিবিএস-১৯৯৯) অবস্থান করায় দারিদ্র সমস্যা প্রকটতর রয়ে গেছে।

বাংলাদেশ তার জন্মলগ্ন থেকে এই দারিদ্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম আরম্ভ করে। কিন্তু তখনকার জনসংখ্যা বৃদ্ধির উচ্চহার, জাতীয় আয় বৃদ্ধির নিম্নহার এবং রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে খুব বেশী সুফল লাভ করা সম্ভব হয়নি। বর্তমানে বিরাজমান দারিদ্র এদেশের উন্নয়নের পক্ষে প্রকট বাধা রূপে বিদ্যমান। বর্তমান নিবন্ধে বাংলাদেশে দারিদ্রের গতি প্রকৃতি এবং দারিদ্র বিমোচনে সরকারী ও এনজিও প্রচেষ্টা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

দারিদ্র সংক্রান্ত পর্যালোচনা

'দারিদ্র বিমোচন' বিষয়টি সর্বপ্রথম আলোচিত হয় সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নে, ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের পর। মহামতি লেনিন যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশে মৌলিক চাহিদার ন্যূনতম প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অভাব দেখে সেই দেশে 'দারিদ্র ভাগাভাগি' বা 'Poverty sharing' চালু করেন। অর্থাৎ সম্পদ যেটুকু আছে তাই সকলে মিলে স্বল্প অথচ সমান পরিমাণে ভাগ করে ভোগ করার নীতি গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আমেরিকা ও ইউরোপের দেশসমূহে দারিদ্রের সরব উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। তখন থেকে দারিদ্র বিষয়ক অলোচনা সে সব দেশে আরম্ব হয় এবং ১৯৫৮ সালে আমেরিকান অর্থনীতিবিদ গলব্রেথ তাঁর 'দারিদ্র বিমোচন' তত্ত্ব প্রদান করেন। তাঁর তত্ত্বেও বলা হয় যে, "অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে সাথে দারিদ্র বিমোচনও অর্থনৈতিক উন্নয়নের আবশ্যিক পূর্বশর্ত।" তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহ ষাটের দশক থেকে 'দারিদ্র বিমোচন' বিষয়ে আলোচনা, নীতি ও কার্যক্রম আরম্ভ করে।

দারিদ্রের প্রকারভেদ

দারিদ্র প্রধানত দুই প্রকার ঃ

ক. অনাপেক্ষিক দারিদ্র (Absolute Poverty) : এই দারিদ্র এমন একটি অবস্থা যেখানে মানুষ তার ন্যূনতম শারীরবৃত্তীয় প্রয়োজন মেটাতে ব্যর্থ হয়। অনাপেক্ষিক দারিদ্রের আবার দু'টি ভাগ রয়েছে। দারিদ্র ও চরম দারিদ্র। এটি নির্ধারণ করা হয় প্রধানত দৈনিক ক্যালোরি গ্রহণের পরিমাপ দ্বারা। বিশ্ব ব্যাংকের মতে ২১২২ এবং জাতি সংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) এর মতে ২১৫০ কিলো ক্যালোরি যদি একজন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি প্রতিদিন গ্রহণ করার সুযোগ না পায়, তবে সে দারিদ্রের মধ্যে আছে। আর এর পরিমাণ যদি ১৮০৫কি. ক্যালোরির নিচে চলে আসে তবে সে চরম দারিদ্রের অন্তর্ভুক্ত।

খ. আপেক্ষিক দারিদ্র (Relative Poverty) : আপেক্ষিক দারিদ্র শারীর বৃত্তীয় চাহিদা পূরণের (২১২২/২১৫০ কি. ক্যালোরি গ্রহণ) পরের একটি অবস্থা, যা কোন সমাজের আয় ও সম্পদ বিতরণে একজন ব্যক্তি বা পরিবারের সামাজিক অবস্থান নির্দেশ করে।

উদাহরণত, আমেরিকায় ১৫% পরিবার দরিদ্র বলে বিবেচিত হয়, যাদের আয় ও সম্পদ বাংলাদেশের উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোর চেয়ে অনেক বেশী উন্নত। এ বিষয়ে মনীষী কার্লমার্কসের একটি উদাহরণ খুব বেশী আলোচিত হয়। একজন ব্যক্তি কুঁড়েঘরে সুখে স্বাচ্ছন্দে বাস করতো। তার কোন অভাববোধ ছিলনা। পরে সেখানে তার একজন প্রতিবেশী এসে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করলো। তখন থেকে ঐ কুঁড়েঘরবাসীর মর্ম পীড়া আরম্ভ হলো এবং সে অনুভব করলো যে সে দরিদ্র। আপেক্ষিক দারিদ্র প্রধানত রাষ্ট্রের সম্পদ বণ্টনে অসমতা ও বঞ্চনার কারণে সৃষ্টি হয়।

এছাড়া নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন আপেক্ষিক ও অনাপেক্ষিক দারিদ্রের সমন্বয় ঘটিয়ে দারিদ্রের একটি নতুন পরিমাপ ব্যবহার করেছেন। এই পরিমাপটিকে 'সেন সূচক' (Sen index) বলা হয়।

দারিদ্রের দুষ্ট চক্র

দারিদ্র একটি সামজে বিদ্যমান থাকলে সেই সামজে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ কম হয়। ফলে বেকারত্ব ও স্বল্প আয়ের জন্ম হয়। এর পাশাপাশি উচ্চ জন্মহার ও শ্রমের বাড়তি

যোগান যুক্ত হয়ে বেকারত্বকে তীব্রতর করে তোলে। ফলে পুনরায় বৃদ্ধি পায় দারিদ্র এবং সৃষ্টি করে স্বল্প উৎপাদনশীলতা। এর সাথে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মস্পৃহার কমতি দেখা দেয়। দেখা দেয় ব্যবস্থাপনা ক্ষেত্রে অদক্ষতা এবং ফলস্বরূপ প্রকট দারিদ্র। একেই বলে দারিদ্রের দুষ্ট চক্র।

বাংলাদেশে দারিদ্রের চিত্র

বাংলাদেশের দারিদ্র পর্যালোচনা করতে গেলে প্রকৃত তথ্যের প্রকট অভাব পরিলক্ষিত হয়। মাত্র কয়েকটি সূত্র থেকে তথ্য পাওয়া যায়, যে গুলোর যথার্থতা নিয়ে স্বদেশী ও বিদেশী অনেক প্রতিষ্ঠানই প্রশ্ন উত্থাপন করে। তবুও ঐ সব উৎসের উপর নির্ভর করা ছাড়া ব্যাপক তথ্য প্রাপ্তির তেমন আর কোন সুযোগ নেই। এখানে উৎসসমূহ আলোচিত হলো।

তথ্য প্রাপ্তির উৎসসমূহ

১। **বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) :** বাংলাদেশে তথ্য প্রাপ্তির সবচেয়ে বড় উৎস এটি। এর বিভিন্ন শুমারী ও জরীপ কার্যক্রম নিম্নরূপ :

(ক) আদম শুমারী প্রতিবেদন (২০০১ সালের প্রতিবেদন অদ্যাবধি অপ্রকাশিত) (খ) খানা ব্যয় জরীফ (House Hold Expenditure Survey) (গ) বিভিন্ন বিষয় ভিত্তিক জরীপ। যেমনঃ কৃষি, আয়, শ্রম, জনসংখ্যা প্রভৃতি বিষয়ক। (ঘ) ১৯৯৫-৯৬ সাল থেকে 'মৌলিক চাহিদা খরচ প্রক্রিয়া (Cost of basic needs method)' নামক চলমান গবেষণা আরম্ভ হয়েছে। এতে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আবাসন, বস্ত্র ও খাদ্য অন্তর্ভুক্ত। এই গবেষণায় ক্যালোরি পরিমাপের পরিবর্তে 'সি বি এন এম' পদ্ধতিতে দারিদ্র পরিমাপ করা হচ্ছে।

২। **পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান :** মাঝে মাঝে এই প্রতিষ্ঠান পুষ্টি ও খাদ্য (ক্যালোরি গ্রহণসহ) সংক্রান্ত জরীপ করে থাকে।

৩। **অর্থ মন্ত্রণালয় ঃ** এই মন্ত্রণালয় 'বার্ষিক অর্থনৈতিক সমীক্ষা' প্রকাশ করে থাকে।

৪। **বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ :** এই প্রতিষ্ঠান 'Analysis of Poverty Trends' নামক একটি দারিদ্র পরিমাপ প্রকল্প ১৯৮৯-৯০ সালে

পরিচালনা করেছে। ২০০১ সালে আরেকটি প্রকল্প পরিচালনা আরম্ভ করেছে। তাছাড়া এই প্রতিষ্ঠান থেকে নমুনা এলাকা ভিত্তিক দারিদ্রাবস্থা এবং বিমোচনের প্রকল্পসমূহের স্থায়িত্ব ও ফলপ্রসূতা বিষয়ক গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়ে থাকে।

৫। **বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থা, বিশ্ব ব্যাংক এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা :** এ সব সংস্থা থেকে দারিদ্র বিমোচন সংক্রান্ত প্রতিবেদন বার্ষিক বা দ্বি-বার্ষিক আকারে প্রকাশিত হয়।

৬। **ব্যানবেইস :** শিক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাবলী বার্ষিক বা দ্বি-বার্ষিক ভিত্তিতে প্রকাশ করে।

দারিদ্র সংক্রান্ত কতিপয় ক্ষেত্রের তথ্য

বাংলাদেশে জি.ডি.পি প্রবৃদ্ধির হার

বিগত দশকে বাংলাদেশে জি.ডি.পি প্রবৃদ্ধির হার সারণি-১এ দেখানো হলো।

সারণি-১

বাংলাদেশে জি.ডি.পি প্রবৃদ্ধির হার

পরিমাপের ভিত্তি বছর	১৯৯০-৯১	১৯৯১-৯২	১৯৯৫-৯৬	১৯৯৬-৯৭	১৯৯৮-৯৯	১৯৯৯-২০০০
১৯৮৪-৮৫ সালের হিসাব	৩.৪	৩.৯	৫.৩৫	৫.৯০	৫.৬৬	৬.০৩
১৯৯৫-৯৬ সালের হিসাব	৩.৩৪	৫.০৪	৪.৬২	৫.৩৯	৪.৮৮	৫.৫০

সূত্র : জাতীয় আয় শাখা, বি বি এস (১৯৯৯) (প্রকাশিত-২০০১)

খাদ্য দ্রব্য প্রাপ্তি

বাংলাদেশে জনগণ গড়ে এক বছরে কী পরিমাণ খাদ্য দ্রব্য লাভ করে, তার চিত্র সারণি-২-এ লক্ষণীয়।

সারণি-২

কতিপয় খাদ্য সামগ্রীর বার্ষিক মাথাপিছু প্রাপ্তির পরিমাণ (কিলোগ্রাম হিসেবে)

খাদ্য সামগ্রীর নাম	সাল	
	১৯৮৭-৮৮	১৯৯৭-৯৮
খাদ্য শস্য	১৬৪.২০	১৫৩.৬০
চা	০.১০	০.২৩
পেঁয়াজ	১.৪০	১.৩০
মরিচ	০.৪৬	০.৪১
ডাল	৫.৬০	৪.৯০
ভোজ্য তেল	১.৪৫	২.১৬
চিনি	২.৯০	২.৫৮
গুড়	৪.৭০	৪.১২
লবণ	৫.১৯	৫.৬৯
মাংস	৩.১৮	৫.০৫
দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য	৯.৫০	১৩.১০

সূত্র : বিবিএস-১৯৯৯ (প্রকাশিত-২০০১)

বাংলাদেশে বর্তমানে জনগণ সারা বছর যে পরিমাণ খাদ্য দ্রব্য আহার হিসেবে লাভ করে, তার গড় মাথা পিছু পরিমাণ সারণি-২-এ বিধৃত হলো। স্মর্তব্য যে, সারণির তথ্য কেবল ভোগের ভাগফল মাত্র। প্রকৃতপক্ষে যারা দরিদ্র তারা এই পরিমাণ ভোগ করার সামর্থ (অর্থ) রাখেনা। কিন্তু বিবেচ্য বিষয় হলো, এত স্বল্প পরিমাণ ভোগ এদেশের দারিদ্রকে দীপ্যমান করে তোলে। এই সারণিতে মাছ প্রাপ্তির তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে ডিম প্রাপ্তির হার ৮৭-৮৮তে ছিল বছরে ১৩টি, ৯৭-৯৮তে দাঁড়িয়েছে ২৩টি।

উল্লেখ্য, সারা বছরে প্রাপ্য ঐ পরিমাণ দ্রব্যকে ৩৬৫দিয়ে ভাগ করলে যে পরিমাণ দাঁড়াবে, তা দিয়ে ১৮০৫ কিলো ক্যালোরি লাভের কোন সম্ভাবনাই নেই। সে হিসেবে এদেশের সোয়া ১৩ কোটি মানুষই চরম দারিদ্রে অবস্থান করার কথা। কিন্তু ভাগ্যবান প্রায় ৫৯% পর্যাপ্ত পরিমাণে ভোগ করে নেয়, তাদের ক্যালোরির ঘাটতি পড়ে না। বাকী ৪১% Poorest of the poor হবার প্রতীক্ষায় দিন গোনে।

বস্ত্র

মৌলিক চাহিদাসমূহের অন্তর্গত বস্ত্র কেবল লজ্জা নিবারণের জন্যই নয়, বরঞ্চ শীত ও তাপ থেকে রক্ষার জন্যও প্রয়োজনীয়। বিগত ২৫ বছর ধরে এদেশের দরিদ্র জনগণ বিদেশী পুরাতন কাপড় ও শীত বস্ত্র দ্বারা নিজেদের আবৃত করতো। রাষ্ট্রীয়ভাবে আমদানী কমে যাওয়ায় পুরাতন কাপড়ও এখন সহজলভ্য নয় এবং ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যেতে বসেছে। বিবিএস-৯৯ এর তথ্যানুযায়ী ১৯৮৭-৮৮ সালে গড়ে প্রতি বছর মাথাপিছু পুরাতন কাপড় প্রাপ্তি ছিল ১ মিটার, ৯৭-৯৮ সালে তার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ০.১০ মিটারে। অবশ্য নতুন কাপড়ের ব্যবহার ৯.৩মিটার থেকে ১২.৩ মিটারে উন্নীত হয়েছে।

বাসস্থান

"বাংলাদেশের পল্লী ও শহরের পরিবারসমূহের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ১ কক্ষ বিশিষ্ট ঘরে বাস করে" (সাদেক, ১৯৯০ ঃ ৮১)। শহরের প্রায় ৩০% পরিবার বস্তিতে বাস করে। মাত্র ১টি কক্ষে স্ত্রী ও সন্তানসহ বাসকরা একটি অমানবিক অবস্থার ইঙ্গিত বহন করে। ২০০১ সালে সরকারী খাস জমিতে, রাস্তার পাশে, রেল লাইনের ধারে এবং ফাঁকা জমিতে বসবাসরত দরিদ্র পরিবারসমূহকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। এরা এখন ভাসমান জনগোষ্ঠি, যাদের রাত কাটানোর কোন ব্যবস্থাই নেই।

শিক্ষা

১৯৯০-৯১ সালের নিরীক্ষাধর্মী এবং ১৯৯২ সালে 'বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা' কার্যক্রম এবং শিক্ষার জন্য খাদ্য ও মাধ্যমিক পর্যায়ে মহিলাদের অবৈতনিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু করার ফলে বিগত ১০ বছরে শিক্ষার হার ৩২% থেকে ৬২% এ উন্নীত হয়েছে (শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ২০০১)। তবে এখনও প্রায় ৩ কোটি বয়স্ক মানুষ অশিক্ষিত এবং ৫০ লক্ষ শিশুকে শিক্ষার আওতায় আনা সম্ভব হয়নি। অপর একটি চিত্র এই যে,

১৯৯৪ সালের হিসাব অনুযায়ী ৫-৯ বছর বয়স্কদের ৯৫% প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, ১০-১৪ বছর বয়স্কদের ৩৪% উচ্চ বিদ্যালয়ে এবং ১৫-২০ বছর বয়স্কদের ৬% মাত্র কলেজ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে শিক্ষারত (বিবিএস-৯৯)। বাংলাদেশের গড়ে প্রাথমিক পর্যায়ে প্রতি ৭০জনে, মাধ্যমিক পর্যায়ে ৩৯জনে, কলেজ পর্যায়ে ৩৩ জনে এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ২৪ জনে ১জন শিক্ষক রয়েছেন।

স্বাস্থ্য

এদেশে নব জাতকের মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ১৯৯০ সালে ছিল ৯৪জন, ১৯৯৮ সালে তা হ্রাস পেয়ে ৫৭ জনে দাঁড়িয়েছে। শিশু মৃত্যুর (১-৪ বছর) হার ১৯৯৮ সালে শতকরা ৬.৩ (বিবিএস-১৯৯৯)। ১৯৯৮ সালের হিসেব অনুযায়ী এদেশে Crude birth rate ১৯.৯ এবং Crude death rate ৪.৮%। যদিও এটি সহনীয় মাত্রায় এসেছে বলে অনেকেই দাবী করেন, কিন্তু এটি কাঙ্ক্ষিত নয় কোনক্রমেই। এদেশের মানুষকে বিশুদ্ধ পানি পান করাবার অভিপ্রায়ে নলকূপের পানি পান করানোর অভ্যেস করাতে ৪০ বছর সময় লেগেছে। বর্তমানে (১৯৯৯) ৮০% লোক নলকূপের পানি পান করে। অথচ আর্সেনিক বিশেষজ্ঞদের মতে প্রায় ২৫% নলকূপ আর্সেনিক দোষে দুষ্ট, সেগুলোকে চিহ্নিত করতেও লাগবে ৯ বছর সময়। এর মধ্যে কত মানব সন্তান আর্সেনিকে আক্রান্ত হবে তা হিসেব করতে হয়তো কয়েক বছর লেগে যাবে।

স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সর্বাধিক সমস্যাগ্রস্ত হচ্ছে এদেশের নারী সমাজ। সন্তান গ্রহণের বা অগ্রহণের সিদ্ধান্তের স্বাধীনতা তার নেই, অথচ নিরাপদ প্রসবের ব্যবস্থাও ৫০% এর ভাগ্যে জুটছেনা গ্রামীণ এলাকায়, শহরাঞ্চলে তা ২৯%। বেশীর ভাগ নারী গর্ভাবস্থায় পাচ্ছে না প্রয়োজনীয় খাবারটুকু, পুষ্টি চিন্তাতো কষ্ট কল্পনা মাত্র। বাংলাদেশের সকল ইউনিয়নে মা ও শিশুকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে, কিন্তু অসুস্থ মহিলার পক্ষে ইউনিয়ন কেন্দ্রে পৌছানোর বাহন জোগাড় করা ও অর্থ ব্যয় এখনও সম্ভবপর হচ্ছে না ৪০% ক্ষেত্রে (মুহাম্মদ, ২০০০)। এ দেশে প্রতি ৪,২৫১ জনে হাসপাতালের ১টি শয্যা এবং প্রতি ৪,৫৯৯জনে ১জন ডাক্তার গড়ে বরাদ্দ রয়েছে (স্বাস্থ্য ও প. ক. মন্ত্রণালয়-১৯৯৯)।

দারিদ্রের গতি প্রকৃতি

১৯৯৬ সালের পরে অনাপেক্ষিক দারিদ্রের পরিমাপ তথ্য আর পাওয়া যায়নি। সেই তথ্য মতে ১৯৮৩-৮৪ সালের সঙ্গে তুলনা নিম্নরূপ ঃ

সারণি-৩

এলাকা ভিত্তিক দারিদ্র ও চরম দারিদ্র পরিমাপ (ক্যালোরি পরিমাপে) (শতকরা হারে)

প্রকৃতি	সাল	এলাকা		
		গ্রাম	শহর	জাতীয়
দারিদ্র	১৯৮৩-৮৪	৬১.৯০	৬৭.৭০	৬২.৬
	১৯৯৫-৯৬	৪৭.১০	৪৯.৭০	৪৭.৫
চরম দারিদ্র	১৯৮৩-৮৪	৩৬.৭০	৩৭.৪০	৩৬.৭৫
	১৯৯৫-৯৬	২৪.৬০	২৭.৩০	২৫.১০

সূত্র : খানা জরীপ-১৯৯৫-৯৬, বিবিএস

দ্রষ্টব্য ঃ ৯৫-৯৬ অর্থ-বছরের Cost of Basic Method দ্বারা উচ্চ পর্যায়ের দারিদ্রের হার ৫৩'১% এবং নিম্ন পর্যায়ের দারিদ্রের হার ৩৫.৬% পরিমাপিত হয়েছে।

দারিদ্র বিমোচন

বাংলাদেশের দারিদ্র বিমোচন প্রচেষ্টাকে নিচের চিত্রে দেখানো যেতে পারে :

চিত্র ঃ ২

দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি

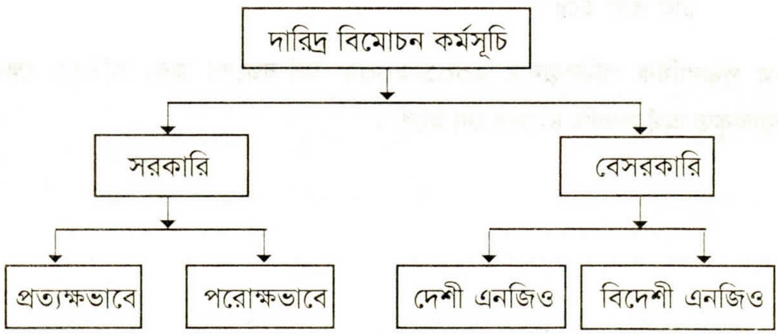

দারিদ্র বিমোচনে সরকারি পরিকল্পনা ও কার্যক্রমসমূহ

বাংলাদেশ সরকারের ৫ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৯৭-২০০২) গৃহীত নীতিসমূহের মধ্যে দারিদ্র বিমোচনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য নীতিসমূহ নিম্নরূপ ঃ

১। দারিদ্র বিমোচনে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও স্বায়ত্ত্বশাসিত সংস্থাসমূহ পৃথক পৃথকভাবে এবং কখনও কখনও সমন্বিতভাবে কর্মসূচি পরিচালনা করবে।

২। সরকারি প্রতিষ্ঠান দারিদ্র বিমোচনে কতিপয় কর্মসূচি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের (এনজিও) সঙ্গে বাস্তবায়ন করবে এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ এনজিওদের কার্যক্রমে সকল প্রকার প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবে।

৩। দারিদ্র বিমোচনে 'মানব সম্পদ উন্নয়ন' কে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে। সরকারি সংস্থা ও এনজিওদের পক্ষ থেকে 'ক্ষুদ্র পর্যায়ের উৎপাদন ও শিল্প বিনির্মাণ'কে উৎসাহিত করা হবে এবং প্রয়োজনীয় ক্ষুদ্র ঋণ জোগান দেয়া হবে। নীতি অনুসারে আত্ম-কর্ম-সংস্থান সৃষ্টি করা হবে।

৫। নারী উন্নয়নকে পর্যাপ্ত অগ্রাধিকার দেয়া হবে এবং ক্ষুদ্র ঋণ ও ট্রেনিং দিয়ে তাদেরকে সহায়তা করা হবে, যাতে তারা আত্ম-কর্মসংস্থান বেছে নিতে পারে।

৬। দারিদ্র পরিমাপের জন্য নিয়মিত ও সময় পরম্পরায় পরিবীক্ষণের পদ্ধতি চালু করা হবে।

৫ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ২০০১-২০০২ অর্থ-বছরের জন্য কতিপয় ক্ষেত্রে বরাদ্দকৃত অর্থ সারণি-৪-দেখানো হলো।

সারণি-৪

৫ম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় ২০০১-২০০২ অর্থ বছরের জন্য কতিপয় ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত বরাদ্দ অর্থ (মিলিয়ন টাকায়)

ক্ষেত্র	বরাদ্দকৃত অর্থ
গ্রামীণ উন্নয়ন	২৮,১০২.২৩
শিক্ষা	৩৬,০৮১.৮৬
স্বাস্থ্য	২০,৮৭৩.৩৫
জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ	৬,৪৪৫.০০
সমাজকল্যাণ, মহিলা ও যুব উন্নয়ন	৪,৪৫.১৮

সূত্র ঃ ৫ম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

দারিদ্র বিমোচনে প্রধান সরকারি কর্মসূচিসমূহ

১। নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি

চরম দরিদ্র পরিবারসমূহকে অনাহার থেকে রক্ষা এবং তাদের পারিবারিক ব্যয় নির্বাহে সহায়তার জন্য সরকার রাজস্ব বাজেট থেকে নিম্নলিখিত কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়ন করছে।

সারণি-৫

চরম দরিদ্রদের অনাহার থেকে রক্ষায় নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি ও ব্যয় ১৯৯৯-২০০০ (কোটি টাকায়)

কর্মসূচি	ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ
কাজের বিনিময়ে খাদ্য	৮০৬.০০
গ্র্যাচুইশাস রিলিফ ও টেষ্ট রিলিফ (জিআর ও টিআর)	২৭২.০০
ভালনারেবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট	২২৮.০০
ভালনারেবল গ্রুপ ফিডিং	২২৯.০০

সূত্র ঃ অর্থ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন-২০০০

২। বিশেষ কর্মসুচি

(ক) দরিদ্রদের গৃহ নির্মাণ ঋণ ও অনুদান

১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছর থেকে ৯৯-২০০০ অর্থ-বছরের জন্য দরিদ্র পরিবারসমূহের গৃহ নির্মাণে ক্রমপুঞ্জিতভাবে স্বল্প সুদে ৪৩কোটি টাকা ঋণ প্রদান এবং সাড়ে ১০কোটি টাকা গৃহ নির্মাণ অনুদান হিসেবে বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়া, সরকারি খাস জমিতে বাস্তুহারা অসহায় পরিবারবর্গের বসবাসের জন্য 'আশ্রয়ন' প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এই প্রকল্প মূলত ১৯৮৭ সালে 'গুচ্ছগ্রাম' নামে ১৯৯১ সালে 'আদর্শগ্রাম' নামে এবং ১৯৯৬ সাল থেকে 'আশ্রয়ন' নামে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এতে টিনের ছাদ ও আরসিসি খুঁটি দ্বারা নির্মিত ১টি ঘর এবং ২ থেকে ৫কাঠা পরিমাণ জমি প্রতিটি পরিবারকে বিনামূল্যে প্রদান করা হয়ে থাকে। বিগত ১৪ বছরে বাংলাদেশে মোট ৪২টি প্রকল্প এলাকায় প্রায় ৩০,০০০ পরিবারকে পুনর্বাসিত করা হয়েছে। গৃহ নির্মাণ ঋণের মাধ্যমে ২২,০০০টি ঘর নির্মিত হয়ে ১ লক্ষ ১০ হাজার লোক আবাসন লাভ করেছে।

(খ) এমপ্লয়মেন্ট ব্যাংক কর্মসূচি

বেকার যুবকদের আত্ম-কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে বন্ধকহীন ও স্বল্পসুদে ঋণ প্রদানের জন্য এই ব্যাংক চালু করা হয়েছে। মার্চ, ২০০০ পর্যন্ত মোট ১৩৬৯ জন বেকার যুবককে ৫ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে।

(গ) দুঃস্থ মহিলাদের অনুদান কর্মসূচি

কেবল তালাকপ্রাপ্তা, বিচ্ছিন্ন থাকা ও অসহায় মহিলাদের জীবন ধারণের জন্য এই কর্মসূচিতে অনুদান প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। ১৯৯৮-৯৯ অর্থ-বছরে প্রায় ২ লক্ষ মহিলাকে এই অনুদান প্রদান করা হয় এবং ১৯৯৯-২০০০ অর্থ-বছরে এই কর্মসূচিতে ২৫কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

(ঘ) গ্রামীণ রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি (আরএমপি)

১৯৮৩ সাল থেকে গ্রামীণ কাঁচা সড়ক মেরামতের জন্য মাসিক বেতন ভিত্তিতে ভূমিহীন দরিদ্র মহিলাদের নিয়োগের মাধ্যমে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা এই কর্মসূচিতে করা হয়েছে। প্রতি ইউনিয়নে ১০জন মহিলাকে এই কর্মসূচিতে নিয়োগ দেয়া হয়। বর্তমানে ৪,১০০টি ইউনিয়নে মোট ৪১,০০০ ভূমিহীন দরিদ্র মহিলা এতে কর্মরত আছেন।

৩। বিত্তহীন পুরুষ ও মহিলাদের ঋণ প্রদান কর্মসূচি

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে এই সরকারি কর্মসূচিতে দরিদ্র ও ভূমিহীন পুরুষ ও মহিলাদেরকে সমিতি গঠনের মাধ্যমে বন্ধকহীন ও স্বল্পসুদে ১ বছর মেয়াদী ঋণ প্রদান করে আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির সুযোগ দেয়া হয়। প্রতি সপ্তাহে কিস্তিতে সুদসহ (১০% সরলসুদ) অর্থ জমা দিয়ে ১ বছরে ঋণ শোধ করতে পারলে পরবর্তী বছরে আবার ঋণ পায়। বিগত ১৪ বছর ধরে প্রতি বছর শোধ করে পুনঃ ঋণ গ্রহণকারী পুরুষ ও মহিলার সংখ্যা উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের ৪৪০টি থানায় এই কর্মসূচি ব্যাপ্ত। এটি ১৯৮০ সাল থেকে কার্যরত এবং সর্ববৃহৎ সরকারি ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান কর্মসূচি। ১৯৯০-৯১ অর্থ বছর থেকে ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছর পর্যন্ত এই কর্মসূচিতে ১,৪৬৬ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে এবং উপকারভোগীর সংখ্যা প্রায় ৪০ লক্ষ।

৪। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর

বাংলাদেশ সরকারের এই দপ্তরটি নিরঙ্কুশভাবে মহিলাদের উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিচালিত হচ্ছে। এর উদ্দেশ্যাবলী হলো ঃ

(ক) নারী উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়ন ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন

(খ) নারীর পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন, বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণ প্রদান ও কর্মসংস্থানে সহায়তাকরণ।

(গ) বেসরকারি মহিলা সংগঠনসমূহ নিয়ন্ত্রণ ও ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি

(ঘ) নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ও আইনী সহায়তা প্রদান।

বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার ২৩৬টি থানায় এর দপ্তর ও কর্মকর্তা রয়েছে এবং ঐ সব থানায় উপরি-উক্ত লক্ষ্য বাস্তবায়নে কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে মোট ২১টি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও নারী উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

৫। সমাজসেবা অধিদপ্তর

বাংলাদেশের সামাজিক কল্যাণ, বেসরকারি সংগঠন ও ক্লাবসমূহের মাধ্যমে মানবিক উন্নয়ন, এতিমখানা পরিচালনা, শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধীদের উন্নয়ন, কিশোর

অপরাধীদের সংশোধন, মাতৃকল্যাণ কেন্দ্রসমূহ পরিচালনা, বয়স্কভাতা প্রদান, দুঃস্থ নারী পুনর্বাসন, গ্রামীণ সমাজসেবা এবং শহর সমাজকল্যাণ কর্মসূচি প্রভৃতি কার্যক্রম বাস্তবায়নে সরকারের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন সংস্থা সমাজসেবা অধিদপ্তর। বাংলাদেশের সকল থানায় এর দপ্তর ও কর্মকর্তা রয়েছে। গ্রামীণ সমাজ সেবার মাধ্যমে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করে (বন্ধকহীন, স্বল্প ও সরলসুদে) আত্ম-কর্ম সংস্থানে সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছে।

৬। যুব উন্নয়ন পরিদপ্তর

শিক্ষিত ও বেকার যুবক-যুবতীদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও বন্ধকহীন স্বল্প সুদে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করে আত্ম-কর্ম সংস্থানে সরকারের এই সংস্থাটি কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে এটি নবীন। এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের ১৮০টি থানায় এ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। তবেএই সংগঠনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমটি ট্রেড ভিত্তিক ও নিবিড় বলে প্রশংসা অর্জন করেছে। প্রধানত মৎস্যচাষ, হাঁস-মুরগী ও গাভী পালন, কুটির শিল্প, মৌমাছি চাষ, ভকেশনাল ট্রেনিং প্রভৃতি এর প্রশিক্ষণের অন্তর্গত।

এনজিও কার্যক্রম

১। বাংলাদেশ রুরাল এ্যাডভান্সমেন্ট কমিটি (BRAC)

বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ এনজিও। দরিদ্র পুরুষ ও মহিলাদের (বর্তমানে ৯৬% মহিলা) বিভিন্ন ট্রেডে ট্রেনিং প্রদান, বন্ধকহীন স্বল্প সুদে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান, বিভিন্ন আত্ম-কর্মসংস্থান ও পেশায় উপকরণ সরবরাহ, কতিপয় ক্ষেত্রে বিপণন সহায়তা, গবাদি-পশু, হাঁস-মুরগী, মৌমাছি পালন প্রকল্পসমূহে কারিগরী ও চিকিৎসা সহায়তা প্রদান, কৃষিকর্মে উন্নত বীজ, সার ও কীটনাশক সরবরাহ দ্বারা ঋণ গ্রহীতা এবং আগ্রহী জনগণকে সহায়তা প্রদান এই এনজিওটির প্রধান কর্মসূচি। এছাড়া দরিদ্র মহিলাদের সচেতনতা সৃষ্টি ও ক্ষমতায়নেও এর ভূমিকা পালন উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের ৪১৮টি থানায় এই এনজিও কর্মরত। বর্তমানে উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা এবং শিশু স্বাস্থ্য, ইপিআই ও ডায়রিয়া নির্মূল কর্মসূচিতে সরকারের উন্নয়ন সঙ্গী হিসেবে কার্যরত। ডিসেম্বর, ২০০০ পর্যন্ত এর উপকারভোগীর সংখ্যা প্রায় ৪৩ লক্ষ।

২। প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন সংস্থা

গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য বন্ধকহীন ও স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান এই এনজিওটির

একটি উল্লেখযোগ্য কর্মসূচি। তবে এর বাইরে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য এর অন্যান্য কর্মসূচি হচ্ছে; মৎস্য চাষ ও পশুপালন, স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন, রেশম প্রকল্প, সেচ প্রকল্প, সামাজিক বনায়ন, নলকূপ বিতরণ প্রভৃতি। নারী সচেতনায়ন ও ক্ষমতায়নসহ নির্যাতিতা নারীর আইনগত ও আর্থিক সহায়তা প্রদান এর অভীষ্ট লক্ষ্য। বাংলাদেশের ৯৭টি থানায় ডিসেম্বর'৯৯ পর্যন্ত এই এনজিও মোট ১৩.৩ লক্ষ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য ৯৮৪.৪ কোটি টাকা (ক্রমপুঞ্জিতভাবে) ঋণ বিতরণ করেছে।

৩। এ্যাসোশিয়েশন ফর সোশ্যাল এ্যাডভান্সমেন্ট **(ASA)**

এই এনজিওটি গ্রামীণ দরিদ্র মহিলাদের বন্ধকহীন ও স্বল্প সুদে ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করে থাকে। বার্ষিক মেয়াদী ঋণ সাপ্তাহিক কিস্তিতে পরিশোধ করতে পারলে দরিদ্র মহিলাগণ পুনরায় ঋণ পেয়ে থাকে। এদের রিকোভারি রেট শতকরা ১০০ ভাগ। ডিসেম্বর ২০০০ পর্যন্ত ১৬ লক্ষ দরিদ্র মহিলার মধ্যে আশা ২১৮৯.৬০ কোটি টাকা (ক্রমপুঞ্জিতভাবে) ঋণ বিতরণ করেছে।

৪। **স্বনির্ভর বাংলাদেশ**

এই এনজিওটির মূল লক্ষ্য মা ও শিশু স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা। এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে দরিদ্র মহিলাদের আগ্রহী করার উদ্দেশ্যে ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ প্রকল্প গ্রহণ করেছে। অবশ্য ৩০% ক্ষেত্রে দরিদ্র পুরুষদেরকেও ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করে থাকে। ২০০০ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট প্রায় ৫ লক্ষ দরিদ্র নারী-পুরুষের মধ্যে ২০৪.৯ কোটি টাকার (ক্রমপুঞ্জিতভাবে) ঋণ বিতরণ করেছে।

৫। কারিতাস সার্বিক মানব উন্নয়ন সংগঠন

খৃষ্ট-ধর্মানুসারী দরিদ্র নারী পুরুষকে ক্ষুদ্র ঋণ, অনুদান ও দুর্যোগকালে ত্রাণ প্রদানের জন্য এই সংগঠনটির সৃষ্টি হয়। পরে তা বাংলাদেশের সকল ধর্মানুসারী নারী-পুরুষের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। এই সংগঠন বাংলাদেশের যে সকল থানায় কর্মরত রয়েছে, তার সব ক'টিতে ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি আজও গ্রহণ করেনি। তবে কর্মরত থানাসমূহে দরিদ্র নারী (প্রধানত) ও পুরুষদের জন্য সামাজিক শিক্ষা ও দুর্যোগকালীন অনুদান প্রদান কর্মসূচি পালন করে যাচ্ছে। ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে এই সংস্থাও বন্ধকহীন

ও স্বল্প সুদ (১২%) সরল সুদ) গ্রহণ করে থাকে। দরিদ্রদের বিভিন্ন ট্রেড ট্রেনিং ও প্রদান করে।

৬। গ্রামীণ ব্যাংক

এই সংস্থাটি এনজিও হিসেবে ১৯৭৯ সালে যাত্রারম্ভ করে। গঠিত দলে দরিদ্র মহিলা ও পুরুষকে ক্ষুদ্রঋণ (বন্ধকহীন ও স্বল্পহারে সরল সুদে) প্রদান পূর্বক আত্ম-কর্মসংস্থানই ছিল এর মূল লক্ষ্য। অন্যান্য এনজিওসমূহ প্রধানত গ্রামীণ ব্যাংকের আদর্শেই ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান কার্যক্রম গ্রহণ করেছিল। ১৯৮৩ সালে বাংলাদেশ সরকার এটিকে ব্যাংকিং সেক্টরের আওতাভুক্ত করেছে। ডিসেম্বর ২০০০ পর্যন্ত বাংলাদেশে এর ১২৪৩টি শাখা গঠিত হয়েছে এবং ক্রমপুঞ্জিত হিসাবে ১৪,৮০৩.২ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে। শতকরা ৯৫ ভাগ উপকারভোগী হচ্ছে দরিদ্র ও দুঃস্থ মহিলা, এদের মোট সংখ্যা প্রায় ৩০ লক্ষ।

দারিদ্র বিমোচনে কতিপয় সুপারিশ

দারিদ্র যে কোন একটি দেশে দীর্ঘদিন ধরে প্রবহমান সুযোগহীনতা, অসম বন্টন ও শোষণের অবশ্যম্ভাবী ফল। এটির অবসান ঘটানো বা দূরীকরণ প্রায় অসম্ভব। বরঞ্চ একে হ্রাসকরণ বা বিমোচনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। তবে সেক্ষেত্রেও গ্রহণ করতে হয় সুদূর প্রসারী, সর্বাত্মক ও সম্মিলিত প্রচেষ্টা। প্রত্যক্ষ কর্মসূচি (যেমন আশ্রয়ণ ও ক্ষুদ্র ঋণ কমূসূচি) যতটা সহায়তা করে, তার চেয়ে পরোক্ষ কর্মসূচি (যেমন, শিক্ষার হার বৃদ্ধি, গ্রামীণ উন্নয়ন, বেকারত্ব দূরীকরণ) দীর্ঘমেয়াদী ভিত্তিতে দারিদ্র বিমোচনে অধিক কার্যকর বিবেচিত হয়। শ্রীলংকা শিক্ষার হার বৃদ্ধি (৯৯%) এবং নিয়োগ ও সম্পদের সুষম বন্টনের মাধ্যমে দক্ষিণ এশিয়ায় দ্রুত দারিদ্র বিমোচনে অগ্রগতি লাভ করেছে। বাংলাদেশের বর্তমান দারিদ্রের হার ৪৭.৫%, অপরপক্ষে শ্রীলংকায় তা ২৭% মাত্র।

বাংলাদেশে দারিদ্র দূরীকরণে নিম্নলিখিত সুপারিশসমূহ বিবেচনা করা যেতে পারেঃ

(ক) শিক্ষার হার বৃদ্ধি ঃ বর্তমানে অর্জিত ৬২% হারকে আগামী ১০ বছরে ১০০% এ উন্নীত করতে হবে।

(খ) নিয়োগ ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ঃ কেবল শিক্ষার প্রসার ঘটালেই চলবেনা, সেই সঙ্গে দেশে নিয়োগ ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা হলে অথবা বিদেশে কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করা হলে দারিদ্রের হার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাবে।

(গ) গণতন্ত্রের বিকাশ ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ঃ দেশে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা সৃষ্টি হলে মানুষের জীবন যাপনে অস্থিরতা দূরীভূত হয় এবং আয় ও সঞ্চয় বৃদ্ধি পায়। ফলে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায় এবং দারিদ্র হ্রাস পায়।

(ঘ) সরকারি ও এনজিও কার্যক্রমে কার্যকর সহযোগিতা সৃষ্টি ঃ পরস্পরকে বিপক্ষ ভাবা এবং সন্দেহের অবকাশ রাখার ফলে দূরত্ব সৃষ্টি হচ্ছে। ফলে কোন পক্ষের কার্যক্রমেই স্থায়িত্ব পাচ্ছে না। এছাড়া কার্যক্রমের দ্বিত্বতা সৃষ্টি সফলতায় বাধা সৃষ্টি এবং আত্ম-কর্মসংস্থানের সুফল লাভে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছে। রাষ্ট্রীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে সমন্বয় ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করতে হবে।

(ঙ) সরকারি সংস্থায় ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের হার ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বর্ধন ঃ সরকারি সংস্থা হিসেবে বিআরডিবি, সমাজ সেবা, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ও যুব উন্নয়ন পরিদপ্তর প্রত্যক্ষভাবে দারিদ্র বিমোচনে নিয়োজিত। এগুলোর মধ্যে যুব উন্নয়নের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ এবং বিআরডিবির সামান্য প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা কার্যকর রয়েছে। সমাজ সেবা ও মহিলা বিষয়ক অধিপ্তরে প্রশিক্ষণ আরম্ভ এবং বিআরডিবিতে পর্যাপ্ত ট্রেড প্রশিক্ষণ এবং আরও অধিকহারে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা গৃহীত হলে গ্রামীণ জনগণ নিজেরাই তাদের দারিদ্রের মোকাবিলায় সমর্থ হবে।

(চ) নারীর ক্ষমতায়ন ঃ বাংলাদেশের প্রায় অর্ধেক জন গোষ্ঠী নারী। এদেরকে আত্ম-কর্সসংস্থানসহ যে কোন পেশায় নিযুক্ত হবার মত শিক্ষা ও মূলধন দিয়ে উপযুক্ত করে তুলতে হবে। প্রয়োজনে প্রশিক্ষণের সুযোগ বৃদ্ধি এবং তা সর্বত্র প্রসারিত করতে হবে। সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কর্মের সুযোগ তাদের দিয়ে নারী ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা হলে দারিদ্রের হার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস পাবে।

(ছ) দুর্নীতি দূরীকরণ ঃ বাংলাদেশের সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি আজ স্থায়ী আসন নিয়ে বসে আছে। সকল ক্ষেত্র থেকে সকল প্রকার দুর্নীতি (কেবল আর্থিক নয়) দূরীকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব হলে দারিদ্র অর্ধেক হ্রাস পাবে। এ বিষয়ে বিশ্বব্যাংকের

প্রতিবেদনে (২০০০) উল্লেখ করা হয় যে, "দুর্নীতি দূর হলে বাংলাদেশে মাথাপিছু আয় দ্বিগুণ হবে।" কেবল দুর্নীতির কারণেই অগ্রসরমান দরিদ্র সমাজ একই বৃত্তে বারবার ঘুরপাক খাচ্ছে।

(জ) সামাজিক উন্নয়ন ঃ সমাজে কল্যাণমূলক সরকারি কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়ন ঘটাতে হবে। বিষয়টি সুদুর প্রসারী। এর মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গি, দেশ প্রেম এবং উন্নয়নমূলক অঙ্গীকার নিহিত রয়েছে। তবে সরকার যদি সামাজিক নিরাপত্তা ও সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিত করতে পারে এবং রাষ্ট্র যন্ত্র যদি নেতৃত্বের বিকাশ ঘটাতে পারে,তাহলে জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি উন্নত হয়, অঙ্গীকার শাণিত হয়। ফলে দারিদ্র বিমোচন সহজ ও দ্রুত হয়ে থাকে।

উপসংহার

বাংলাদেশ সরকার বিশাল দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মঙ্গলার্থে দারিদ্র বিমোচনের যে সকল নীতি ও কর্মসূচি গ্রহণ করেছে, তার উল্লেখযোগ্য অংশই বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে পরিচালিত হচ্ছে। অবশ্য কেয়ার, নোরাড, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক এবং ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন সাহায্য সংস্থার অর্থায়নও উল্লেখযোগ্য। ২০০০-২০০১ সালে প্রথমবারের মত বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করেছে। এখন প্রয়োজন শুধু দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ক্রয় ক্ষমতার উন্নতি সাধন। অবশ্য সুষ্ঠু বন্টন ব্যবস্থাও এর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

প্রথমত, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে নীতি ও কর্মসূচি প্রণয়ন, যা দক্ষ শ্রমিক চাহিদা বৃদ্ধি করে।

দ্বিতীয়ত, মৌল দ্রব্য ও সেবাদির সর্বজনীন অধিকার নিশ্চিতকরণ, যাতে দারিদ্র সীমার নিচের অংশের জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নত হয় এবং তাদের উপার্জন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

বাংলাদেশে যতদিন কর্মসংস্থান ও নিয়োগের মাধ্যমে বেকার, সাময়িক বেকার ও ছদ্ম বেকারদের কর্মের সংস্থান না হবে, ততদিন দারিদ্র বিমোচন ফলপ্রসূ হবেনা। কর্ম-সংস্থানের মধ্যে আত্ম-কর্মসংস্থান অর্থনীতিবিদদের মতে এ দেশে অধিকতর উপযোগী বিবেচিত হয়। সে লক্ষ্যে অগ্রসর হলে দারিদ্র বিমোচন কাঙ্ক্ষিত ফল দানে সমর্থ হতে পারে।

তথ্য নির্দেশিকা

তারেক, ড. মোহাম্মদ ও নাসিরুদ্দিন (সম্পা.)। ***উন্নয়ন অর্থনীতি ঃ বাংলাদেশ পরিপেক্ষিত*** । বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। ২০০১। ***পরিসংখ্যান বর্ষ গ্রন্থ ১৯৯৯***। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

মিলি, বেগম রোকসানা ও রহমান মো. লুৎফর। ২০০। **গ্রামীণ নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ম.বি.অ.-এর প্রকল্পের কার্যকারিতা** । *লোক প্রশাসন সাময়িকী,* ১৬শ সংখ্যা, বিপিএটিসি, ঢাকা।

মুহাম্মদ, আনু। ১৯৯৯। ***উন্নয়ন ধারার ২৭ বছর ঃ বাংলাদেশের অর্থনীতি, রাষ্ট্র ও সমাজের গতি প্রকৃতি বিশ্লেষণ*** । *লোক প্রশাসন সাময়িকী,* ১৪শ সংখ্যা, বিপিএটিসি, ঢাকা।

মোস্তাকীম, গোলাম। ১৯৯৫। ***বাংলাদেশে দারিদ্রের স্বরূপ*** । লোক প্রশাসন সাময়িকী, ৪র্থ সংখ্যা, বিপিএটিসি, ঢাকা।

হক, তৃণা। ১৯৮৮। ***বাংলাদেশে দারিদ্রের গতি প্রকৃতি ঃ পরিসংখ্যান ভিত্তির পর্যালোচনা*** । বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা, ৬ষ্ঠ খন্ড, ঢাকা।

BRAC. 2000. Annual Report. BRAC Press, Dhaka.

Department of Women Affairs. 2000. ***The Annual Report.*** Dhaka.

Department of Social Service. 2000. ***The Annual Report.*** Dhaka.

Government of Bangladesh. 1998. ***The Fifth Five year Plan. M/O Planning,*** Dhaka.

Government of Bangladesh. 2000. ***Annual Report. M/O Finance,*** Dhaka.

Jones. S. 1976. ***An Evaluation of Rural development Programmers in Bangladesh.*** *The Journal of Social Studies, No. 6, pp.51-62.*

Sadeque, M. 1990. ***Survival Pattern of the Rural Poor : A Case Study of a Village of Bangladesh.*** Northern Book Center, New Delhi.

Seen, Amartya. 1984. ***Poverty and Famines : An Essay on Entitlement and Deprivation.*** Oxford Calendar Press, U.K.

Stratton, Paul. 1999. ***Poverty Concepts and Measurement.*** *Harvard* University Press, USA.

UNICEF, BBS. 1994. *Progotir Pithy* : ***Progress Towards the Achievement of the Goals for the 1999s.*** Pioneer Printing Press, Dhaka.

World Bank.-2000. *Bangladesh* : ***Food and Nutrition Sector Review. Report No. 5312-BD.*** Dhaka.

ISSN 1605-2021

লোকপ্রশাসন সাময়িকী
একবিংশতিতম সংখ্যা,
ডিসেম্বর ২০০১, পৌষ ১৪০৮

বাংলাদেশে শিল্পায়ন ঃ তিন দশকের অভিজ্ঞতা

মোঃ আমজাদ হোসেন *

Industrialization in Bangladesh : Experience of three Decades

- Md. Amzad Hossain

Abstract : Industrialization plays pivotal role in the economic development of a country. It is evident from the experiences of many developed countries that in one hand, industrialization ensure the proper utilization of natural resources and on the other hand, it helps to maintain balance of the economy by absorbing huge mass of increasing population. Bangladesh experiences different policy regime in the industrial sector since independence. It has pivoted its nationalized policy into a market oriented liberalized policy. However due to inherent problems in the economy and the implementation failure the industrial sector has seen a frustrated takeoff over the last decades. These bottleneck and drawback must be removed for bringing dynamism in this sector so that it can play dominant role in the economic development of our country.

ভূমিকা

অর্থনীতির দ্রুত বিকাশের পথে শিল্পখাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই শিল্প খাতকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের "Power House" হিসেবে অভিহিত করা হয়। বর্তমান বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর উন্নয়নের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এসব দেশের শিল্প খাতের দ্রুত ও ক্রমবর্ধমান বিকাশের কথা গুরুত্বের সাথে স্বীকার করতে হয়। বর্তমান সময়ের দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জনকারী (Emerging Tiger) দেশগুলো যেমন- সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, মালেশিয়ার দিকে তাকালেও শিল্প খাতের গুরুত্বের কথা অনুমান করা যায়। বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ হওয়া সত্ত্বেও এদেশের

* প্রভাষক, অর্থনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্পের গুরুত্বকে খাট করে দেখার অবকাশ নেই। শিল্পখাত একদিকে যেমন প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করে তেমনি অন্যদিকে দ্রুত বৃদ্ধিমান উদ্বৃত্ত জনসংখ্যার কর্ম সংস্থানের মাধ্যমে অর্থনীতির ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। একারণে স্বাধীনতার পর পরই শিল্প খাতের উন্নয়নে বিভিন্ন নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়। এর ফল হিসেবে আমরা গত তিন দশকে বাংলাদেশের অর্থনীতির কাঠামোগত যে পরিবর্তন দেখতে পাই তা হচ্ছে জিডিপিতে কৃষিখাতের অবদান হ্রাস এবং অন্যান্য খাতের অবদান বৃদ্ধি। কিন্তু জিডিপিতে অন্যান্য খাতের অবদান চোখে পড়ার মত বৃদ্ধি পেলেও, শিল্প খাতের অবদান খুব সামান্য বেড়েছে। শিল্পখাতের উন্নয়নে স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই শিল্প জাতীয়করণ নীতি গ্রহণ করা হয় কিন্তু সরকার পরিবর্তনের অব্যবহিত পরেই বিরাষ্ট্রীকরণ নীতি গ্রহণ করা হয়। ১৯৮০ এর দশকের শুরু শিল্পখাতে বাজারমুখী সংস্কার নীতি গ্রহণ করা হয়। বলতে গেলে, এখনো এ বাজারমুখী বিরষ্ট্রীকরণ নীতি অব্যাহত রয়েছে। বিভিন্ন সময়ে সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে এ নীতিগুলোর প্রয়োগ বিভিন্ন মাত্রা লাভ করেছে। ফলে এ নীতিগুলোর মিথস্ক্রিয়া (interaction) বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি করছে। এ সকল সমস্যার ফলে একদিকে সৃষ্টি হয়েছে রাষ্ট্রীয় খাতে অলাভজনক ও বোঝাস্বরূপ কয়েকটি কর্পোরেশনের অধীনে বিভিন্ন শিল্প এবং অন্যদিকে বেসরকারি খাতে রুগ্ন শিল্পের (Sick Industries) সংখ্যা আশংকাজনকভাবে বৃদ্ধি। বাস্তবিক পক্ষে, সরকারি নীতিমালা 'Enterprenurial Development' এ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেনি। তাই শিল্পখাতে দীর্ঘমেয়াদী স্থবিরতা বিরাজ করছে অর্থাৎ জিডিপিতে শিল্পখাতের অবদান গড়ে ১২-১৫ শতাংশের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে (সারণী-১)

সারণী -১ ঃ জিডিপিতে বিভিন্ন খাতের অবদান, ১৯৭৩-১৯৯৯

	১৯৭৩-১৯৭৮	১৯৭৯-১৯৮২	১৯৮৩-১৯৮৮	১৯৮৯-১৯৯২	১৯৯৩-১৯৯৫	১৯৯৫-২০০০
জিডিপি প্রবৃদ্ধি	৪.১২	৪.৫৩	৪.১০	৪.২১	৪.৪০	৫.৭১
কৃষি	২৭.৪	৪.১২	২৪.০৭	২৫.৭৫	২৬.০৫	৩২.১
শিল্প	১৫.৩	১৫.৮৩	১৬.১৫	১৬.৩০	১৬.৪৫	১৯.৪
নির্মাণ	৫.৩	৬.৪৮	৩.৩২	৬.১৭	৫.৭৫	৭.৬৫
সেবা	৫২.০	৫৫.৮৩	৫৬.৪৬	৫১.৭৮	৫১.৭৫	৫৪.০২

উৎস ঃ Asia-Pacific Development Journal. Vol 5, No. 1, জুন ১৯৯৮, পৃঃ ৭৫ এবং বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমীক্ষা বিভিন্ন সংখ্যা

নোট ঃ (২)-(৬) নং কলমের সংখ্যাগুলো ১৯৮৭/৮৫ সালের স্থির দামে এবং ৭নং কলামের সংখ্যাসমূহ ১৯৯৫/৯৬ সালের স্থির মূল্যে।

তাই শিল্পখাতের এ স্থবিরতার কার্যকারণ সমূহ সম্পর্কে অবহিত হওয়া বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। আলোচ্য প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশের শিল্পখাতের যথাযথ বিকাশ না হওয়ার কারণসমূহ উদঘাটনের প্রচেষ্টা চালানো এবং এর সাথে সাথে শিল্পখাতের বিদ্যমান সমস্যাগুলো কাটানোর উপায় অনুসন্ধানের চেষ্টা করা এবং বিগত তিন দশকের শিল্পনীতির সমালোচনা মূলক আলোচনার মাধ্যমে শিল্পখাতের বর্তমান পারফরমেন্স তুলে ধরা। এ প্রবন্ধের আলোচনায় Secondary উপাত্তের সাহায্য নেয়া হয়েছে তবে কোন জটিল গাণিতিক ও সংখ্যাতাত্ত্বিক (Empirical & Econometric) মডেল estimate করা হয় নাই।

এ প্রবন্ধ ১০টি অংশে বিভক্ত। দ্বিতীয় অংশে বাংলাদেশে শিল্প পুঁজি বিকাশের ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম অংশে যথাক্রমে ১৯৭০, ১৯৮০ এবং ১৯৯০ এর দশকের শিল্পখাতের সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। ষষ্ঠ অংশে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম বর্ণনা করা হয়েছে। ৭ম অংশে বিসিক এর কার্যক্রম সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। অষ্টম অংশে শিল্পখাতের প্রতিবন্ধকতা সমূহ এবং তাদের সমাধানের উপায়সমূহ আলোচনা করা হয়েছে। নবম অংশে বাংলাদেশের শিল্পায়নে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নীতির প্রভাব সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হয়েছে। এবং সবশেষে ভবিষ্যতের করণীয় সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

২.০ বাংলাদেশে শিল্প পুঁজির বিকাশ ঃ ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত

পৃথিবীর অনেক উন্নয়নশীল দেশের ন্যায় বাংলাদেশের শিল্পখাত এখনো অনুন্নত অর্থাৎ বাংলাদেশের শিল্প পুঁজি যথাযথভাবে বিকশিত হয় নাই। যথেষ্ট কাঁচামাল সহ প্রাকৃতিক সম্পদ এবং সস্তা শ্রমিক থাকলেও প্রয়োজনীয় উদ্যোগের অভাবে আমাদের শিল্পখাত এখনো সংকুচিত। এর কার্যকারণ ঐতিহাসিক। প্রাচীন বাংলার সামাজিক স্তর বিন্যাসের দিকে লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাই যে, বাংলার সমাজে ব্যবসামুখী বৈশ্য শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে নাই। শুধুমাত্র ভারতের উত্তরপূর্বাঞ্চলের জনগণের মাঝে ব্যবসা বাণিজ্যের আগ্রহ লক্ষ্য করা গিয়েছিল (হবিব-১৯৭৮)। ঔপনিবেশিক আমলেও এ ধারা বজায় ছিল। ইংরেজ শাসনামলে অবিভক্ত বাংলার হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র ছিল ইংরেজী শিক্ষিত হয়ে সরকারি চাকুরি করা। অবশ্য বৃটিশ সরকারের নীতিও শিল্পপুঁজির বিকাশ না হবার অন্যতম কারণ।

ইংরেজ সরকার এ দেশকে শিল্পের কাঁচামালের উৎস হিসেবে এবং বৃটেনে উৎপাদিত শিল্প পণ্যের বাজার হিসেবে ব্যবহার করে। ঐ সময় জনগণের চাপে বোম্বাই, কলকাতা, মাদ্রাজ প্রভৃতি বড় শহরে কিছুসংখ্যক শিল্প কারখানা স্থাপন করা হয়। কিন্তু ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর অধিকাংশ হিন্দু জমিদার, পুঁজিপতি, উদ্যোক্তা, ব্যবসায়ী, ব্যাংকার এ দেশ ত্যাগ করে ভারতে পাড়ি জমায়। ফলে, শিল্পসহ বাংলাদেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এক শূন্যতার সৃষ্টি হয়। ভারত থেকে আগত দরিদ্র, চাষী মজুর ও সামান্য পুঁজি মালিকদের দ্বারা এ শূন্যতা পূরণ করা সম্ভব হয় নাই। ঐ সময়কার পূর্ব পাকিস্তানের জিডিপি-র প্রতি লক্ষ্য করলে বিষয়টি স্পষ্টতঃ ধরা পড়ে। ১৯৪৭/৪৮-১৯৬৯/৭০ সালে পূর্ব পাকিস্তানের জিডিপিতে কৃষি খাতের অবদান ছিল প্রায় ৬৭.৮ শতাংশ। অন্যদিকে শিল্প খাতের অবদান ছিল মাত্র ৩.৮ (উদ্দিন-১৯৭৫) শতাংশ। পাকিস্তান সরকারের আমলেও বাংলাদেশের শিল্প খাতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয় নাই। এ দেশের বৈদেশিক মুদ্রার সিংহভাগই সাবেক পশ্চিম পাকিস্তানে শিল্প স্থাপনে ব্যয় করা হয়। আঞ্চলিক বৈষম্যের কারণে পাকিস্তান আমলে বাংলাদেশের শিল্প খাতে স্থবিরতা বিদ্যমান ছিল। ১৯৪৯/৭০ হতে ১৯৬৯/৫০ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের উন্নয়ন ব্যয় ছিল ৮৯৩০.২ কোটি টাকা (১৯৫৯/৬০ সালের স্থির দামে) যার মধ্যে মাত্র ২৮৯৭.৭ কোটি অর্থাৎ ৩০ শতাংশের সামান্য বেশী পূর্ব পাকিস্তানে ব্যয়িত হয়েছিল। যদিও পরবর্তীতে এ দেশের শিল্পের উন্নয়নে East Pakistan Industrial Development Corporation (EPIDC) স্থাপন করা হয় তথাপি দৃঢ় রাজনৈতিক অংগীকার এর অভাবে এ দেশে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিল্প স্থাপন করা হয় নাই। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ১৯৬০ এর দশকে সমগ্র পাকিস্তানের শীর্ষ বিশজন শিল্পপতির মধ্যে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশে মাত্র একজন শিল্পপতি ছিল বাকী ১৯ জনই ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানের। তাই স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের শিল্প খাতের উন্নয়নে বিভিন্ন নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়। কিন্তু এ সকল নীতির অন্তর্নিহিত দুর্বলতার কারণে বাংলাদেশের শিল্পখাতে পুঁজির যথাযথ বিকাশ ঘটে নাই।

৩.০ ১৯৭০ এর দশকে বাংলাদেশের শিল্পখাত

১৯৭০ এর দশকের প্রথমভাগ (১৯৭০-১৯৭৫) ছিল শিল্প রাষ্ট্রীয়করণের। দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের সফল অবসানে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হবার অব্যবহিত পরেই ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ২৭ এর মাধ্যমে

বাংলাদেশে শিল্পের জাতীয়করণ শুরু হয়। ১৯৭০ সালে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী মেনিফেস্টো, দলের মধ্যকার আভ্যন্তরীণ চাপ এবং পশ্চিম পাকিস্তানের ফেলে যাওয়া ও ধ্বংস করা শিল্প সমূহের সংস্কারসহ পুনরায় চালুকরণ জাতীয়করণ প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে (বায়েস ও অন্যান্য ১৯৯৮)।

জাতীয়করণ এর প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে সকল পরিত্যক্ত মাঝারি ও বড় শিল্প ইউনিটসমূহকে সরাসরি সরকারি তত্ত্বাবধানে আনা হয় এবং বেসরকারি শিল্প ইউনিট যাদের স্থির সম্পদের মূল্যমান ১৫ মিলিয়ন টাকার বেশী ছিল সেগুলোকেও সরকারি পরিচালনার আওতায় আনা হয়। শুধুমাত্র ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প এবং বিদেশী মালিকাধীন শিল্প ইউনিটগুলো সরকারি খাতের বাইরে রাখা হয়। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী এ সময়কালে ৭২৫টি ইউনিটকে ১০টি সরকারি কর্পোরেশনের আওতায় আনা হয় যেগুলার মোট স্থির সম্পদের মোট পরিমাণ ছিল মোট শিল্প মূলধনের ৯২ শতাংশ (বায়েস ও অন্যান্য ১৯৯৮)। আরেক তথ্য মতে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত পাট, বস্ত্র ও চিনি শিল্পের ১৬৯টি প্রতিষ্ঠানকে সরকারি খাতের আওতায় আনা হয়। সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, জাতীয়করণের প্রাথমিক পদক্ষেপে দেশের শিল্প সম্পদ তথা বড় বড় স্থাপনাসমূহ সরকারি নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। এছাড়া, এ সময়ে বেসরকারি বিনিয়োগের সীমা ২.৫ মিলিয়ন টাকায় নির্ধারণ করা হয়।

স্বাধীনতার পর অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতার যে মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে শিল্প জাতীয়করণ প্রক্রিয়া শুরু হয় সে উদ্দেশ্য মোটামুটি ব্যর্থ হয় বলে মনে করা হয় যদিও অনেকে দেখানোর চেষ্টা করেন যে, ১৯৭২ হতে ১৯৭৫ পর্যন্ত সময়ে জাতীয়করণকৃত শিল্প সমুহে টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয় (সোবহান ১৯৮৩)। জাতীয়করণকৃত শিল্প সমূহের ব্যর্থতার জন্য নিম্নোক্ত কারণ সমূহকে দায়ী করা হয়-(১) জাতীয়করণকৃত শিল্প সমুহের পরিচালনায় অদক্ষতা (২) জাতীয়করণকৃত শিল্প সমূহের সায়ত্ত্বশাসনের অভাব (৩) ব্যবস্থাপনাগত ত্রুটি (৪) বাণিজ্যিককরণের পরিবর্তে জাতীয়করণকৃত শিল্প সমূহের পরিচালনা কাঠামোকে দলীয়করণ ইত্যাদি (বায়েস ও অন্যান্য ১৯৯৮)। এছাড়া, কাজকর্মে সমন্বিত প্রচেস্টা না থাকা, সুস্পষ্ট দায়িত্ব বন্টন না হওয়া পারস্পরিক আস্থা সৃষ্টির অভাব এবং সুষ্ঠ পরিকল্পনার অভাব, জনগণের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের কোন উদ্যোগ না করা ইত্যাদির ফল এ সময়ে জাতীয়করণকৃত শিল্পসমূহে নজিরবিহীন দুঃখজনক অবস্থার সৃষ্টি হয় (হাবিব উল্যাহ, ১৯৭৭, পৃষ্ঠা ২৮২-৮৭)।

জাতীয়করণের এ পর্যায়ে বেসরকারি শিল্প ইউনিটসমূহও হতাশাজনক পারফরমেন্স প্রদর্শন করে। বিশেষতঃ ব্যক্তিগত বিনিয়োগ সীমা ২.৫ মিলিয়ন টাকা অযৌক্তিক প্রমানিত হয়। এবং দেশের আইন শৃংখলা পরিস্থিতির এতই অবনতি হয় যে, ব্যক্তিগত উদ্যোক্তাগণ শিল্প স্থাপনে আস্থা হারাতে থাকে। সর্বোপরী পুনরায় জাতীয়করণের ভয় এবং সরকারি প্রণোদনার অভাবে বেসরকারি খাতও সংকুচিত হয়।

এ অবস্থা হতে উত্তোরণের লক্ষ্যে এবং বেসরকারি খাতকে প্রণোদিত করার উদ্দেশ্যে ১৯৭৫ সালে পুনরায় নতুন শিল্পনীতি ঘোষণা করা হয়। এ নীতির প্রধান দিকগুলো ছিল ঃ

(ক) বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ সীমা শিথিল করে ২.৫ মিলিয়ন টাকা হতে ৩০ মিলিয়ন টাকায় (পরবর্তীতে ১০০ মিলিয়ন) উন্নীত করা হয়। তবে ১০০ মিলিয়ন টাকার উর্ধ্বে বিনিয়োগের জন্য জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিলের অনুমোদন লাভ আবশ্যকীয় করা হয়।

(খ) বেসরকারি উদ্যোক্তাগণকে প্রণোদিত করার উদ্দেশ্যে রাজস্ব ও আর্থিক প্রণোদনা প্রদানের কথা ঘোষণা করা হয়।

(গ) আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে শিল্প বিকেন্দ্রীকরণ ও স্থানীয়করণের প্রতি জোর দেয়া হয়।

(ঘ) পরবর্তী ১৫ বছর পর্যন্ত জাতীয়করণ করা হবে না বল ঘোষণা করা হয়।

(ঙ) শিল্প ইউনিটসমূহের জন্য কর অবকাশের ঘোষণা দেয়া হয়।

(চ) উল্লেখযোগ্য পরিমাণে মুদ্রার অবমূল্যায়ন করা হয়।

(ছ) বিদেশী বিনিয়োগকে আকৃষ্ট করার জন্য বিভিন্ন প্রণোদনা প্রদানের কথা ঘোষণা করা হয় (শিল্পনীতি ১৯৭৫)

সরকারের এ সকল নীতিমালা যথাযথভাবে কার্যকরী হবার পূর্বেই ১৯৭৫ সালে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন ঘটে। এ পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশের শিল্প খাতে বিরাষ্ট্রীয়করণ অধ্যায় শুরু হয়। বিরাষ্ট্রীয়করণ নীতির মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ ছিল ঃ

(ক) বেসরকারি বিনিয়োগের সীমা প্রত্যাহার

(খ) বিনিয়োগ প্রক্রিয়া সহজীকরণ;

(গ) বিরাষ্ট্রীয়করণ অধ্যাদেশ জারী;

(ঘ) পুঁজিবাজারের পুনর্জীবন ;

(ঙ) স্থির বিনিময় হতে ব্যবস্থাপিত চলমান বিনিময় হারে পরিবর্তন;

(চ) রপ্তানী বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ (বায়েস ও অন্যান্য, ১৯৯৮)

কিন্তু বিরাষ্ট্রীয়করণের এ পদক্ষেপসমূহও শিল্পখাতকে গতিশীল করতে ব্যর্থ হয়। এর কারণ বহুবিধ। প্রথমতঃ বিরাষ্ট্রীয়করণকৃত শিল্পসমূহকে শুধু নামমাত্র দামেই বিক্রি করা হয় নাই উপরন্ত রাজনৈতিক সুবিধাভোগী দলীয় এমন সব কর্মীদের কাছে বিক্রি করা হয় যাদের ন্যূনতম 'entrepreneurial ability' ছিল না। অর্থনৈতিক যৌক্তিকতা নয় বরং দলীয়করণই ছিল শিল্প বিরাষ্ট্রীয়করণের মূলনীতি। এছাড়া এসকল শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্রেতাগণকে ঋণ সুবিধাসহ বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হয়। কিন্তু অভিজ্ঞতা ও আন্তরিকতার অভাবে এ মালিকগণ এ সকল প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় ব্যর্থ হয়, এবং অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান রুগ্ন হয়ে পড়ে। শিল্পের রুগ্নতার সুযোগে মালিকগণ ব্যাংক থেকে পুনরায় ঋণ নিতে থাকে কিন্তু শিল্পকে গতিশীল করতে ব্যর্থ হয়। ফলে তারা ঋণ পরিশোধেও ব্যর্থ হয়। এভাবেই আমাদের সমাজে ঋণ খেলাপী শ্রেণীর আবির্ভাব হয়।

সামগ্রিকভাবে দেখা যায়, নীতিমালায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হলেও ৭০-এর দশকে শিল্পখাত ছিল মোটামুটি স্থবির যা নিম্নের সারণী হতে স্পষ্ট। এ দশকে জিডিপিতে কৃষিখাতের অবদান কমলেও শিল্পখাতের অবদান খুব একটা পরিবর্তীতে হয় নাই। নীতিমালার সুষ্ঠ প্রয়োগের অভাবে এ দশকে শিল্পখাতের এ স্থবিরতা স্থায়ী রূপ ধারণ করে। বিআইডিএস এর উদ্যোগে সোবহান ও আহসান (১৯৮৪) বিরাষ্ট্রীয়করণকৃত শিল্প ইউনিট সমুহের উপর এক সমীক্ষা চালান। গবেষণায় দেখা যায় যে, ১৯৭৬-১৯৮৩ সাল পর্যন্ত বিরাষ্ট্রীয়করণকৃত শিল্প ইউনিটসমূহের মধ্যে নমুনায়নে ব্যবহৃত ৩৫টির মধ্যে ১৯টির উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, ১১টিতে উৎপাদন হ্রাস পায় এবং ৫টি শিল্প স্থাপনা বন্ধ হয়ে যায়। নমুনাকৃত শিল্পগুলোর মধ্যে মাত্র ৮টির মুনাফা বৃদ্ধি পায়, অন্যগুলোর অবস্থা পূর্বের চেয়ে খারাপ হয়। এছাড়া বিরাষ্ট্রীয়করণকৃত শিল্পসমূহে শ্রমিক ছাঁটাই হতে থাকে এবং সরকারি ঋণ পরিশোধেও এ প্রতিষ্ঠানসমূহ হতাশাজনক পারফরমেন্স প্রদর্শন করে। সুতরাং ৭০ এর দশকের শেষভাগের বিরাষ্ট্রীয়করণ মিশ্র ফলাফল নির্দেশ করে।

সারণী-২ ঃ ১৯৭২/৭৩ সালের স্থির দামে ১৯৭৩/৭৪-১৯৮১/৮২ সময়ে বাংলাদেশের জিডিপি গঠন ও প্রবৃদ্ধি

(মিলিয়ন টাকা)

বছর/খাত	কৃষি	শিল্প	অন্যান্য	জিডিপি
১৯৭৩/৭৪	২৮৮২৭ (৫৭.০)	৩৪০২ (৬.৭)	১৮৩৪০ (৩৬.৩)	৫০৫৬৯ (১০০)
১৯৭৪/৭৫	২৮৫৩৭ (৫৪.৬)	৫৪৮১ (১০.৫)	১৮২৬৪ (৩৪.৯)	৫২২৮২ (১০০)
১৯৭৫/৭৬	৩১৯৬৫ (৫৪.৩)	৫৮৭৭ (১০.০)	২০৯৪৪ (৩৫.৭)	৫৮৬৮৬ (১০০)
১৯৭৬/৭৭	৩০৯০৩ (৫২.০)	৬১১৭ (১০.৩)	২২৪৪৯ (৩৭.৭)	৫৯৪৬৯ (১০০)
১৯৭৭/৭৮	৩৪০১৯ (৫৩.২)	৬৬৪১ (১০.৩)	২৩৩২২ (৩৬.৫)	৬৩৯৮২ (১০০)
১৯৭৮/৭৯	৩৩০৮২ (৫০.০)	৭০৬৫ (১০.৭)	২৬০৮০ (৩৯.৩)	৬৬২২৭ (১০০)
১৯৭৯/৮০	৩৩১৩৬ (৪৪৯.৪)	৭২১০ (১০.৮)	২৬৭.৪৯ (৩৯.৮)	৬৭০.৯৫ (১০০)
১৯৮০/৮১	৩৪৯.৯০৮ (৪৮.৭)	৭৬০২ (১০.৬)	২৯১.৩৪ (৪০.৭)	৭১৬.৪৪ (১০০)

উৎস ঃ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, বিভিন্ন সংখ্যা।

নোট ঃ বন্ধনীয় সংখ্যাসমূহ জিডিপিতে খাতের অবদান নির্দেশ করছে।

৪.০ ১৯৮০ এর দশকে বাংলাদেশের শিল্পখাত

১৯৮০ এর দশকে পরিবর্তিত বিশ্ব প্রক্রিয়ার সাথে মিল রেখে বিশ্বব্যাংক ও আই. এম. এফ উন্নয়নশীল দেশসমূহ উন্নয়নের নতুন কৌশল হিসেবে বাজারমুখী অর্থনৈতিক

সারণী-২ ঃ ১৯৭২/৭৩ সালের স্থির দামে ১৯৭৩/৭৪-১৯৮১/৮২ সময়ে বাংলাদেশের জিডিপি গঠন ও প্রবৃদ্ধি

(মিলিয়ন টাকা)

বছর/খাত	কৃষি	শিল্প	অন্যান্য	জিডিপি
১৯৭৩/৭৪	২৮৮২৭ (৫৭.০)	৩৪০২ (৬.৭)	১৮৩৪০ (৩৬.৩)	৫০৫৬৯ (১০০)
১৯৭৪/৭৫	২৮৫৩৭ (৫৪.৬)	৫৪৮১ (১০.৫)	১৮২৬৪ (৩৪.৯)	৫২২৮২ (১০০)
১৯৭৫/৭৬	৩১৯৬৫ (৫৪.৩)	৫৮৭৭ (১০.০)	২০৯৪৪ (৩৫.৭)	৫৮৬৮৬ (১০০)
১৯৭৬/৭৭	৩০৯০৩ (৫২.০)	৬১১৭ (১০.৩)	২২৪৪৯ (৩৭.৭)	৫৯৪৬৯ (১০০)
১৯৭৭/৭৮	৩৪০১৯ (৫৩.২)	৬৬৪১ (১০.৩)	২৩৩২২ (৩৬.৫)	৬৩৯৮২ (১০০)
১৯৭৮/৭৯	৩৩০৮২ (৫০.০)	৭০৬৫ (১০.৭)	২৬০৮০ (৩৯.৩)	৬৬২২৭ (১০০)
১৯৭৯/৮০	৩৩১৩৬ (৪৪৯.৪)	৭২১০ (১০.৮)	২৬৭.৪৯ (৩৯.৮)	৬৭০.৯৫ (১০০)
১৯৮০/৮১	৩৪৯.৯০৮ (৪৮.৭)	৭৬০২ (১০.৬)	২৯১.৩৪ (৪০.৭)	৭১৬.৪৪ (১০০)

উৎস ঃ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, বিভিন্ন সংখ্যা।

নোট ঃ বন্ধনীয় সংখ্যাসমূহ জিডিপিতে খাতের অবদান নির্দেশ করছে।

৪.০ ১৯৮০ এর দশকে বাংলাদেশের শিল্পখাত

১৯৮০ এর দশকে পরিবর্তিত বিশ্ব প্রক্রিয়ার সাথে মিল রেখে বিশ্বব্যাংক ও আই. এম. এফ উন্নয়নশীল দেশসমূহ উন্নয়নের নতুন কৌশল হিসেবে বাজারমুখী অর্থনৈতিক

সংস্কারের প্রতি মনোযোগ দানের পরামর্শ প্রদান করে। এ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে বাংলাদেশ কাঠামোগত সমন্বয় নীতিসমূহ (Structural Adjustment Policies) গ্রহণ করে। এ নীতির আওতায় সরকার ১৯৮২ সালের ১লা জুন বেসরকারি খাতকে অধিকতর গুরুত্ব প্রদান ও সরকারি খাতকে সীমিতকরণের অংগীকার ব্যক্ত করার মাধ্যমে নতুন শিল্পনীতি ঘোষণা করে। এ শিল্পনীতির প্রধান দিকগুলো ছিল ঃ

(ক) সরকারি খাতের শিল্পসমূহের ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহারের লক্ষ্যে এগুলোর মেরামত;

(খ) সংযোজন শিল্প হতে ক্রমান্বয়ে কলকব্জার নির্মাণ শিল্প গড়ে তুলতে পুঁজি বিনিয়োগে উৎসাহ প্রদান;

(গ) রপ্তানীমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানকে উৎসাহিত করা;

(ঘ) দক্ষ ও লাভজনক আমদানী বিকল্প শিল্প সমূহকে সংরক্ষণের মাধ্যমে উৎপাদনে উৎসাহিত করা;

(ঙ) বেসরকারি খাতের বর্ধিত অংশ গ্রহণের মাধ্যমে শিল্পায়নের গতি ত্বরান্বিত করা;

(চ) সরকারি খাতকে মূল ও ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা;

(ছ) শুল্ক কাঠামোর যৌক্তিকীকরণ; এবং যথাযথ রাজস্ব প্রণোদনা প্রদান। শিল্প নীতি-১৯৮২);

উপরোক্ত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণ করার লক্ষ্যে ব্যাপক বেসরকারিকরণ প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয়। এ সময়ে পাট ও বস্ত্র খাতের অনেক শিল্প ইউনিটকে বেসরকারি খাতে হস্তান্তর করা হয়। বিরাষ্ট্রীয়করণকৃত শিল্প ইউনিটের সংখ্যা ১৯৮২ সালের ১১৬ থেকে ১৯৮৩ সালে ২১৭টিতে উন্নীত হয়। এবং ১৯৮৬ সালের জুনে এ সংখ্যা ৪৮২তে উন্নীত হয়। বিরাষ্ট্রীয়করণের মূল লক্ষ্য ছিল রুগ্ন ও অলাভজনক শিল্প ইউনিটসমূহকে বেসরকারি খাতে ছেড়ে দিয়ে এগুলোকে লাভজনক করা এবং ব্যাপক ভর্তুকী এড়ানো। কিন্তু বেসরকারিকরণের এ প্রক্রিয়ায়ও সরকার দলীয়করণের উর্ধ্বে উঠতে ব্যর্থ হয়। দৃঢ় রাজনৈতিক অংগীকারের অভাবে তৎকালীন সামরিক সরকার তার অবস্থানকে সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে দলীয় সুবিধাভোগীদের কাছে নামমাত্র মূল্যে শিল্প হস্তান্তর করে। শুধুমাত্র অলাভজনক প্রতিষ্ঠানসমূহই নয় লাভজনক সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকেও ব্যাপকভাবে বেসরকারি মালিকানায় হস্তান্তর করা হয়। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়

যে, ১৯৮২ সালের জুন মাসের আগে বিক্রয়কৃত কারখানাগুলোর মধ্যে লাভজনক শিল্প ইউনিটের সংখ্যা ছিল ৩২% এবং এরশাদ আমলে এ সংখ্যা হচ্ছে ৭৮% (আকাশ০১৯৮৪, পৃষ্ঠা ১১)। এ নব্য শিল্প মালিকগণ শিল্প পরিচালনার নামে ব্যাংক থেকে কোটি কোটি টাকা গ্রহণ করেছে কিন্তু পরিচালনগত দক্ষতা না থাকায় তাদের পদক্ষেপ সফলতা লাভ করেনি বরং অনেক চালু শিল্প কারখানা রুগ্ন হয়ে পড়ে। এ রুগ্ন শিল্প গুলোকে বাঁচানোর লক্ষ্যে নব্য শিল্প মালিকগণ পুনরায় ব্যাংক ঋণের দারস্থ হন। কিন্তু এ টাকা রুগ্ন শিল্পোন্নয়নের কাজে না লাগিয়ে অভিজাত এলাকায় বাড়ী করেছে, লেটেস্ট মডেলের গাড়ী কিনেছে নিজিদের সন্তানদের শিক্ষার নাম করে বিদেশে পাঠিয়েছে। ফলে রুগ্ন শিল্প অরো রুগ্ন হয়েছে এবং বাংলার সমাজে ঋণ খেলাপী, লুটেরা শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছে। যারা জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রকে নিয়ন্ত্রণ করছে এবং দেশের শিল্প, সংস্কৃতি প্রভৃতিকে বিনষ্ট করে দেশের উন্নয়নের পথে অপতৎপরতায় লিপ্ত রয়েছে। ১৯৮৩-১৯৮৮ সময়ে বিরাষ্ট্রীয়করণকৃত পাট শিল্পসমূহের উপর ভাস্কর ও মুশতাক (১৯৯৫) এক গবেষণা পরিচালনা করেন। এ গবেষণায় তাঁরা দেখান যে, বিরাষ্ট্রীয়করণে নীতি শিল্প কারখানার ম্যানেজারিয়াল এবং স্থায়ী শ্রমিকের উপর বড় ধরনের ঋণাত্মক প্রভাব ফেলে অন্যদিকে নৈমিত্তিক শ্রমিকের কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে যথার্থ ভূমিকা পালন করে। এছাড়া ৮০-এর দশকে বিরাষ্ট্রীয়করণকৃত শিল্প ইউনিটসমূহের উপর বিনায়ক সেন (১৯৯৭) এক সমীক্ষা পরিচালনা করেন। উক্ত সমীক্ষা হতে দেখা যায় যে, ৪০ শতাংশ বিরাষ্ট্রীয়করণকৃত শিল্প কারখানা বন্ধ হয়ে যায় এবং মোট সংখ্যার ৫ শতাংশের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় নাই। যদিও বন্ধ হয়ে যাওয়া বিরাষ্ট্রীয়করণকৃত শিল্পসমূহের অর্ধেকেরও বেশীর পারফরমেন্স বিরাষ্ট্রীয়করণের পূর্বে সন্তোষজনক ছিল। কিন্তু এ প্রতিষ্ঠানসমূহের বন্ধের কারণ হিসেবে বিরাষ্ট্রীয়করণকে দায়ী করা যায় না। অন্যান্য বিষয় যেমন পূঁজির অপ্রতুলতা, ঋণের বোঝা, উদ্যোক্তার অদক্ষতাকেও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসেবে বিবেচনা করা যায়। তবে বিরাষ্ট্রীয়করণকৃত শিল্প ইউনিটসমূহের মধ্যে যেগুলো বাজার চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রেখে নতুন নতুন দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদন করেছে সেগুলো অপেক্ষাকৃত ভাল পারফরমেন্স প্রদর্শন করেছে। তথাপি এ দশকে বিরাষ্ট্রীয়করণ নীতি কর্ম সংস্থান ২৫% হ্রাস করেছে।

সুতরাং এ কথা বলা যায় যে, বিশ্বব্যাংক ও আই এম এফ-এর সুপারিশ মোতাবেক পরিচালিত কাঠামোগত সমন্বয় নীতির আওতায় বাংলাদেশের ১৯৮২ সালের

শিল্পনীতি শিল্পখাতে গতিশীলতা আনতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারেনি (সারণী পঃ ১,২,৩)। তবে এ সময়ের উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে তৈরী পোষাক শিল্পের ব্যাপক বিকাশ (সারণী ঃ পঃ ৫)। এ শিল্প একদিকে যেমন বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সহায়তা করছে (সারণী প ঃ ৬); তেমনি অন্যদিকে বিপুল জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে চলেছে।

৫.০ ১৯৯০ এর দশকে বাংলাদেশের শিল্পখাত

১৯৮০ এর দশকের ধারাবাহিকতায় প্রণীত ১৯৯১ সালের শিল্পনীতিকে বাংলাদেশের শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার পথে এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ১৯৯১ সালে নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল ক্ষমতায় আসীন হন। এ সরকার শিল্পায়ন প্রক্রিয়াকে গতিশীল করার লক্ষ্যে অধিকতর বাজারমুখী উদারনীতি গ্রহণ করে। ব্যক্তিগত বিনিয়োগকে প্রণোদিত করার উদ্দেশ্যে শিল্প ঋণের সুদের হার হ্রাস করে এবং শিল্পোদ্যোক্তাদের ঋণ সুবিধা প্রদান করে এবং বিদেশী বিনিয়োগকারীদের জন্য নীতিমালা সহজ করে। এ শিল্পায়ন প্রক্রিয়া ছিল অধিকতর রপ্তানী নির্ভর। দেশী বিদেশী অনেক প্রতিষ্ঠান সরকারি নীতিমালায় প্রণোদিত হয়ে শিল্প বিনিয়োগে এগিয়ে আসে। (সারণী ৭ ও ৮) তবে বিদেশী প্রতিষ্ঠানসমূহ কৃষিভিত্তিক ও ভারী শিল্পসমূহের পরিবর্তে সেবামূলক শিল্পসমূহে অধিকতর বিনিয়োগ করে (সারণী ৮)।

এ সময়ে আমদানী প্রক্রিয়াকে উদারীকরণ করা হয়; আমদানীর উপর থেকে বিভিন্ন ধরনের শুল্ক ও শুল্ক বহির্ভূত বাধাসমূহ অপসারণ করা হয়। এর ফলে শিল্প উপকরণ সমূহের পাশাপাশি বিভিন্ন প্রকারের ভোগ্যদ্রব্য অবাধে আমদানী হতে থাকে (সারণী ১১) এবং বিলাস দ্রব্যসমূহও আমদানী হতে থাকে। মুক্ত বাজার অর্থনীতির অধীনে আগত বিদেশী দ্রব্যসমূহ দেশীয় বাজার পুরোপুরি দখল করে নেয়। এবং দেশীয় পণ্যসমূহ গুণগতমান নিম্নমানের কারণে বিদেশী দ্রব্যসমূহের কাছে মার খেতে থাকে। ফলে দেশীয় শিল্পসমূহ রুগ্ন হতে থাকে। আবার বিদেশী এ সকল পণ্য নকলের মাধ্যমে এক শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী বাজার দখল করতে থাকে, ফলে ক্রেতা সাধারণ প্রতারিত হতে থাকে।

আবার ১৯৯১-৯৫ সময়কালে নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকারের অংগীকার থাকলেও অবনতিশীল আইন শৃংখলা পরিস্থিতি শিল্পখাত কতিপয় অর্থনৈতিক কারণে উল্লেখযোগ্য গতিশীলতা প্রদর্শনে ব্যর্থ হয়। উদাহরণস্বরূপ এ সময়ে আন্তঃমন্ত্রণালয় সম্পর্ক এমন খারাপ হয় যে কোন মন্ত্রণালয় সিদ্ধান্ত নিলে অন্য মন্ত্রণালয় তা বাতিল করতে দ্বিধা বোধ করতো না। এছাড়া দলীয়কর্মীদের সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজি এমন স্তরে উন্নীত হয় যে প্রকৃত উদ্যোক্তাগণ শিল্প বিনিয়োগে অনুৎসাহিত হয়। ১৯৭৯ সাল থেকে ১৯৯০ দশকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত বিরাষ্ট্রীয়করণকৃত ২০০টি শিল্প ইউনিটের উপর তানবীর আকরাম (১৯৯৮) এক গবেষণা পরিচালনা করেন। গবেষণায় তিনি দেখান যে, বেসরকারি শিল্প ইউনিটসমূহের ঋণের বোঝা সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রায় দ্বিগুণ। ঋণের ক্রমপুঞ্জিতা, ব্যবস্থাপনাগত অদক্ষতা, বাংলাদেশের বিরাষ্ট্রীয়করণকৃত শিল্পসমূহের হতাশাজনক পারফরমেন্সের মূল কারণ। এছাড়া ১৯৯১-১৯৯৬ সালে বিরাষ্ট্রীয়করণকৃত ১৩টি শিল্প ইউনিটের উপর বিশ্বব্যাংক এক গবেষণা পরিচালনা করে। এ গবেষণা হতে দেখা যায় যে, বিরাষ্ট্রীয়করণের পরে ১৩টি ইউনিটের মধ্যে ৭টির মাসিক মুনাফা ১৮৫% বৃদ্ধি পেয়েছে, ৩টি ইউনিটের মোট উৎপাদন ১৫% এবং গড় শ্রম উৎপাদনশীলতা ৭১% বৃদ্ধি পেয়েছে এবং একক প্রতি খরচ ২১% হ্রাস পেয়েছে। ৬টি ইউনিটের সামর্থ ব্যবহার ৩% বেড়েছে এবং ৭টি প্রতিষ্ঠানের মোট বিক্রয় রাজস্ব ৭৭% বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ৯টি প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ ১৮% বেড়েছে। সমীক্ষা হতে আরো দেখা যায় যে, ৩টি প্রতিষ্ঠান অলাভজনক অবস্থান থেকে লাভজনক অবস্থানে উন্নীত হয়েছে এবং কেবলমাত্র ২টি প্রতিষ্ঠানের অবস্থা পূর্বের চেয়ে খারাপ হয়েছে। উপরোক্ত ফলাফলের ভিত্তিতে বিশ্বব্যাংক বিরাষ্ট্রীয়করণ প্রক্রিয়া দ্রুততর করার প্রতি জোর দিয়েছে।

১৯৯০ এর দশকের শেষার্ধে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসে এবং শিল্পোন্নয়নে পূর্ববর্তী সরকারের নীতি অনুসরণ করে। কিন্তু দক্ষিণ এশিয়ার মুদ্রা বাজারের সংকট, বিশ্ব অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ায় মন্দাভাব আমাদের আমদানী উপকরণের উর্ধ্বগতি এবং বিশ্ববাজারে রপ্তানী ব্যয়ের নিম্নগতির ফলে বিগত কয়েক বছরে শিল্পখাত চরম হতাশাজনক পারফরমেন্স প্রদর্শন করে। এছাড়া ১৯৯৮ সালের প্রলয়ংকরী বন্যা শিল্পখাতকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। এফ.বি.সি.সি আই এর এক সমীক্ষা মতে

১৯৯৮ সালের বন্যায় ৫০০ শিল্প ইউনিটকে ক্ষতিগ্রস্ত করে যেখানে ক্ষতির পরিমাণ ছিল ৪২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে ক্ষতির পরিমাণ ছিল ১৮.৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং গার্মেন্টস শিল্পসমূহে ক্ষতির পরিমাণ ছিল ৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো-৯৯৮) তবে সরকারের নীতিমালার কারণে শিল্পখাতে স্থানীয় এবং বৈদেশিক বিনিয়োগের নতুন দিগন্ত সূচিত হয়েছে।

শিল্পখাতে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে সরকার নতুন শিল্পনীতি ১৯৯৯ অনুমোদন করেছে যার প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ হচ্ছে ঃ

(ক) আগামী এক দশকে মোট দেশজ উৎপাদনের শতকরা ২৫ ভাগ শিল্প খাত থেকে যোগান দেয়ার এবং মোট শ্রমশক্তির ২০ ভাগ শিল্পখাতে নিয়োজিত করা;

(খ) একটি গতিশীল বেসরকারি খাত সৃষ্টি করা যা শিল্পায়ন ও বিনিয়োগে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে;

(গ) শিল্প স্থাপনে দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা;

(ঘ) শ্রমঘন শিল্প প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ প্রদান;

(ঙ) বিদ্যমান উৎপাদন ক্ষমতার সর্বাত্মক ব্যবহার;

(চ) শিল্প পণ্যের বহুমুখীকরণ ও দ্রুত রপ্তানী বৃদ্ধি;

(ছ) রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকায় অবস্থিত শিল্পসমুহে ১০ বছরের জন্য আয়কর রেয়াত এবং ১০ বছর পর রপ্তানী আয়ের উপর শতকরা ৫০ ভাগ আয়কর রেয়াত প্রদান;

(জ) রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকায় উপকরণ সরবরাহ করার উদ্দেশ্যে পশ্চাদ সংযোগ শিল্প স্থাপনে উৎসাহিত করা ইত্যাদি (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক জরিপ ১৯৯৯)।

এছাড়া, সরকার প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে (মংলা, ঈশ্বরদী, সৈয়দপুর, কুমিল্লা) আরো রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকা স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং বিভিন্ন প্রণোদনা নীতি প্রণয়ন করেছে এবং বেসরকারি

উদ্যোগে রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকা প্রতিষ্ঠার অনুমতি দিয়েছে। এছাড়া, সফটওয়্যার শিল্প ও কৃষিপণ্য এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ খাতের শিল্পকে উৎসাহিত করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকে একটি সম মূলধন ও উদ্যোগ তহবিল প্রতিষ্ঠা করেছে। ১৯৯০ এর দশকে শিল্পখাতের উল্লেখ্যযোগ বৈশিষ্ট হচ্ছে বর্ধিত হারে বেসরকারিকরণ। এ সময় সরকার ৩৩টি শিল্প প্রতিষ্ঠান ব্যক্তি মালিকানায় হস্তান্তর করেছে এবং আরো শিল্প ইউনিট এ প্রক্রিয়ার আওতায় এসেছে। নব্য বেসরকারি করণকৃত শিল্প ইউনিটসমূহের পারফরমেন্স পরিমাপের জন্য সরকারি উদ্যোগে কোন গবেষণা পরিচালনা করা হয় নাই। অন্যদিকে, বেসরকারি উদ্যোগে পরিচালিত গবেষণার ফলাফল মিশ্র।

এছাড়া, এ সময়ে সরকার প্রথমবারের মত শ্রমিক কর্মচারিদের স্বার্থ বিবেচনা করে ৮টি বস্ত্রকল শ্রমিক কর্মচারিদের নিকট হস্তান্তর করেছে এবং আরো একটি বস্ত্রকল ও ১টি পাটকল হস্তান্তর প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সামগ্রিকভাবে বলতে গেলে, ১৯৯০ এর দশকের দ্বিতীয় ভাগ অপেক্ষা প্রথম ভাগে শিল্পখাত ধনাত্মক পারফরমেন্স প্রদর্শন করে। ১৯৯১ সালে গঠিত নতুন সরকার পূর্ববর্তী সরকারের ব্যর্থতাকে অতিক্রম করে অর্থনীতির দক্ষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে শিল্পখাতে গতিশীলতা সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়। অর্থাৎ ১৯৯২-১৯৯৬ সময়কালে শিল্পখাতে বাংলাদেশের বহিঃ বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসেবে অবস্থান গড়ে নিতে সমর্থ হয়। কিন্তু ১৯৯৬ সালে গঠিত সরকার পূর্ববর্তী সরকারের গতিমান প্রক্রিয়াকে ধরে রাখতে সমর্থ হয়নি। এ দশকের শিল্প পণ্য এবং শিল্প উপকরণের আমদানী ও রপ্তানী কাঠামো থেকে ব্যাপারটি আরো স্পষ্ট হয় ঃ

সারণী -৩ ঃ শিল্প পণ্যের আমদানী কাঠামো ১৯৯১-২০০০

(মিলিয়ন ইউ, এস ডলার)

আইটেম	'৯১	'৯২	'৯৩	'৯৪	'৯৫	'৯৬	বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধির হার (১৯৯২-১৯৯৬)	'৯৭	'৯৮	'৯৯	'২০০০	বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার (১৯৯৬-২০০০)
শিল্প উপকরণ	৬৯০	৬৭৯	৬৩৮	৭১৩	৯২৪	১০৭৬	১০.০৩	১৩০৩	১১৪৬	১১০৪	১২২৫	৪০৯
পুঁজি দ্রব্যসমূহ	১২৩১	১২৮৯	১৩৪৬	১৩০০	১৬৮৮	১৯৬৮	১০.৪৩	১৯৩৭	২০৭২	১৯৬৯	২১৩৩	২.১৯

উৎস ঃ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০০২।

সারণী -৪ ঃ শিল্প পণ্যের রপ্তানী কাঠামো ১৯৯১-২০০০

(মিলিয়ন ইউ, এস ডলার)

দ্রব্যসমূহ	'৯১	'৯২	'৯৩	'৯৪	'৯৫	'৯৬	বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধির হার ১৯৯২ ১৯৯৬	'৯৭	'৯৮	'৯৯	'২০০০	'২০০১	বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধির হার ১৯৯৬-২০০০
পাটজাত দ্রব্য	২৯০	৩০১	২৯২	২৮৪	৩১৯	৩২৯	২.৭০	৩১৮	২৮১	৩০৪	২৬৬	২৩০	-৬.৫৪
চামড়া	১৩৪	১৪৪	১৪৮	১৬৮	২০২	২১২	৯.৭৯	১৯৫	১৯০	১৬৮	১৯৫	২৫৪	৪.৮৩
উভেন আর এমজি	৭৩৬	১০৬৪	১২৪০	১২৯২	১৮৩৫	১৯৪৯	২২.৭১	২২৩৮	২৮৪৩	২৯৮৫	৩০৮৩	৩৩৬৪	১১.৮৫
নীট আর এমজি	১৩১	১১৯	২০৫	২৬৪	৩৯৩	৫৯৮	৩৮.৫৮	৭৬৩	৯৪০	১০৩৫	১২৭০	১৪৯৬	২০২৮
রাসায়নিক	৪০	২৫	৫৫	৫৪	১০৮	৯৮	৩৪.২৮	১০৮	৭৪	৭৯	৯৪	৯৭	১.৫৭

উৎস ঃ বার্ষিক রপ্তানী আয় (১৯৯০-৯১ হতে ১৯৯৮-৯৯) পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

৬.০ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম

ছয়টি শিল্প কর্পোরেশনের অধীনে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ বাংলাদেশের শিল্প খাতের গতিশীলতার পথে অন্যতম অন্তরায় হিসেবে বিরাজ করছে। এ শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহ দেশের মোট শিল্পের স্থির সম্পদের ৯২ শতাংশ দখল করে আছে। কিন্তু সাংগঠনিক দুর্বলতা, অদুরদর্শিতা, অনভিজ্ঞ পরিচালনা, ক্রটিপূর্ণ ব্যবস্থাপনা, কর্তা ব্যক্তিদের দুর্নীতি, ট্রেড-ইউনিয়নসমূহের অবাঞ্ছিত কার্যক্রমের ফলে এ সকল প্রতিষ্ঠান অলাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। এসকল প্রতিষ্ঠান গড়ে প্রতিবছর ১০০ কোটি টাকা নীট লোকসান দিচ্ছে এবং ব্যাংক ঋণের সাহায্যে টিকে আছে। এসকল কর্পোরেশনের মোট খেলাপী ঋণের পরিমাণ, ১৯৯৮/৯৯ সালের হিসেবে, ১৪৮৭.৪৯ কোটি টাকা। (সারণী ৯ ও সারণী ১০)। গত ২ নভেম্বর ২০০০ সালে সংবাদে প্রদত্ত অর্থমন্ত্রীর এক তালিকা থেকে দেখা যায় যে, ১৯৯৯ সালের জুন পর্যন্ত খেলাপী ঋণের তালিকায় শীর্ষস্থানে আছে সরকারি খাতের প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস কর্পোরেশন (বি.টি.এম.সি) যার খেলাপী ঋণের পরিমাণ ৬ শত ৩ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা। এর পরেই আছে সরকারি খাতের আরেক প্রতিষ্ঠান চিটাগাং স্টিল মিলস লিমিটেড যার খেলাপী ঋণের পরিমাণ ৫ শত ৪২ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকা। সরকারি খাতের এ প্রতিষ্ঠানসমূহ শিল্প খাতকেই স্থবির করছে না উপরন্তু ব্যাংকিংসহ অন্যান্য খাতেও ঋণাত্মক প্রভাব ফেলছে। বিশ্বব্যাংকের এক রিপোর্ট মতে ১৯৯৩-৯৪ অর্থ বছরে ১৫৫টি রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প প্রতিষ্ঠানের মোট লোকসানের পরিমাণ ছিল ১০.৭৩ বিলিয়ন টাকা (এডিপির ১২% এবং জিডিপির ১.২%)। ১৯৯৫ এবং ১৯৯৭ সালে এ পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৭.৪ বিলিয়ন এবং ৮.৩ বিলিয়ন। বিশ্বব্যাংকের রিপোর্ট থেকে আরো জানা যায় রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে সর্বমোট ২,৫৯,০০০ জন কর্মী নিয়োজিত রয়েছেন যাদের প্রত্যেকের জন্য বছরে ব্যয় হয় ৫৪,০০০-১,৬৭,০০০ টাকা। এবং এসব প্রতিষ্ঠানে উদ্বৃত্ত কর্মীর সংখ্যা ২০-৫০ শতাংশ। তীব্র লোকসানের কারণে এসকল প্রতিষ্ঠানের নীট সম্পদ ঋণাত্মক হয়ে পড়েছে। ফলে এসকল প্রতিষ্ঠানসমূহ শুধুমাত্র সরকারি বাজেট বরাদ্দ এবং রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংকসমূহ থেকে গৃহীত ঋণের মাধ্যমে টিকে আছে। কিন্তু চূড়ান্তভাবে এ ঋণ কুঋণে পরিণত হয় যা রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংকসমূহকে আর্থিকভাবে দুর্বল করে দেয়। বিশ্বব্যাংকের রিপোর্টে দেখা গেছে ১৯৯৩ সালে রাস্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসমূহের ঋণের ৫০ শতাংশই রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য ব্যয় করা হয়েছে। ব্যাংক ব্যবস্থা

থেকে সরকারের এই বিপুল পরিমাণ ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগ বাধাগ্রস্ত করেছে।

সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের এই বিরাট লোকসানের কারণ বহুবিধ। প্রধান কারণগুলো হচ্ছে উপযোগ সেবাসমূহ যেমন বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস, প্রভৃতির ব্যাপক সিস্টেম লস্ এবং উদ্ধৃত্তকর্মী ও অপচয়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে লোকসানী এ প্রতিষ্ঠানসমূহকে কতদিন এভাবে বাঁচিয়ে রাখা হবে? এ প্রশ্নের উত্তর খুবই সহজ। এ প্রতিষ্ঠানসমূহকে ভর্তুকীর মাধ্যমে বেশীদিন বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হবে না এবং দিনে দিনে এ প্রতিষ্ঠানসমূহ আমাদের জন্য দুর্দশাই বয়ে আনবে। তাই এ ব্যবস্থা থেকে পরিত্রাণের একমাত্র পথ হচ্ছে অনতি বিলম্বে এগুলোর বেসরকারিকরণ। বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা হতে দেখা যায় যে, ১৯৭৫-৭৬ সাল থেকেই মূলতঃ সরকার বেসরকারিকরণের প্রতি মনোনিবেশ করেছে এবং কিছু প্রতিষ্ঠানকে ইতিমধ্যে বেসরকারি উদ্যোক্তাদের হাতে ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু নতুন বিরাষ্ট্রীয়করণকৃত শিল্প ইউনিটসমূহের উৎপাদন প্রক্রিয়া তথা পাফরমেন্স বিষয়ে সরকার কোন দৃষ্টি দেয়নি। উপরন্তু বিরাষ্ট্রীয়করণ প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত মন্থর, ১৯৯০-১৯৯৯ সাল পর্যন্ত সরকার মাত্র ৩৩টি প্রতিষ্ঠানকে ব্যক্তিগত উদ্যোক্তার হাতে ছেড়ে দিয়েছে। একটি সফল বিরাষ্ট্রীয়করণ কর্মসূচি পাঁচটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে (ক) উত্তম প্রস্তুতি (খ) সর্বসাধারণের সমর্থন লাভ (গ) সঠিক বিক্রয় প্রক্রিয়া (ঘ) সঠিক ব্যবস্থাপনা (ঙ) অলাভজনক প্রতিষ্ঠানের উদ্বৃত্ত কর্মী ছাঁটাইয়ের জন্য প্রস্তুত থাকা (কুদ্দুস-৯৬)। কিন্তু বাংলাদেশে বিরাষ্ট্রীয়করণ প্রক্রিয়া গ্রহণের সময় উক্ত বিষয়গুলোর প্রতি প্রয়োজনীয় মনোনিবেশ করা হয়নি।

৭.০ বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন কার্যক্রম

গ্রামীণ, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প বিকাশের মাধ্যমে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক) বেকারত্ব হ্রাস, মহিলাদের কর্মসংস্থান এবং নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে ধনাত্মক ভূমিকা পালন করছে। বিসিকের এক উপাত্ত থেকে দেখা যায় যে, ১৯৯৩/৯৪ সালের বিসিকের শিল্প উদ্যোক্তার সংখ্যা ১১,৯৭৭ হতে ১৯৯৭/৯৮ সালে ২৫,১৯১ এ বৃদ্ধি পেয়েছে। এসময়ে অন্য কোন সমীক্ষায় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের সংখ্যা ৯,৭৫৪ হতে ১৬,৬৪২ টিতে বৃদ্ধি পায়। এ সময়ে কর্মসংস্থানের সংখ্যা ৫০,৮৭৩ হতে ৮১,৫২১ এ উন্নীত হয় (বাংলাদেশ

অর্থনৈতিক জরিপ, ১৯৯৯)। কিন্তু উপযুক্ত পৃষ্ঠপোষকতা এবং ঋণ সুবিধা ও শ্রমিকের প্রশিক্ষণ এবং ন্যায্য মজুরী নিশ্চিত না করার কারণে এ খাত যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারছে না।

৮.০ বাংলাদেশের শিল্পখাতের বিকাশের পথে মূল অন্তরায়সমূহ এবং তাদের সমাধানের উপায়

স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও আত্মনির্ভর অর্থনীতি গড়ার স্বপ্নকে সামনে রেখে বাংলাদেশের শিল্পখাতে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নীতিমালা গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু এসকল নীতিমালার বাস্তবায়নে যে ধরনের দৃঢ় রাজনৈতিক অংগীকারের প্রয়োজন ছিল তা কোন সরকারই যথাযথভাবে প্রদর্শন করতে পারেনি। এ কারণে একদিকে দেশের সমগ্র অর্থনীতির উপর জগদ্দল পাথরের মত চেপে আছে অলাভজনক রাষ্টায়ত্ত শিল্প কর্পোরেশনসমূহ এবং অন্যদিকে বিদ্যমান রয়েছে অদক্ষ, দুর্বল ও রুগ্ন বেসরকারি শিল্পসমূহ। আবার তৈরী পোষাক শিল্প দ্রুত প্রসার লাভ করলেও এসকল প্রতিষ্ঠানের পশ্চাদ সংযোগকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে না তোলার কারণে এবং বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নতুন নতুন নীতিমালার ফলে এ শিল্পও হুমকির সম্মুখীন। অন্যদিকে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পসমূহ অদক্ষ জনগোষ্ঠীকে কাজে লাগানোর মাধ্যমে বেকার সমস্যার সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও সরকারের অদূরদর্শিতার কারণে এ শিল্পসমূহ হতাশাজনক পারফরমেন্স প্রদর্শন করেছে। সামগ্রিকভাবে দেখতে গেলে বাংলাদেশের শিল্প খাতের স্থবিরতার মূল কারণ দক্ষ উদ্যোক্তা শ্রেণীর অভাব। একজন উদ্যোক্তা শুধুমাত্র শিল্প প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপাকর ভূমিকাই পালন করে না তাকে বিভিন্ন ধরনের ঝুঁকিও গ্রহণ করতে হয়। উদ্যোক্তা ও শিল্প ব্যবস্থাপকের প্রধান পার্থক্য হচ্ছে, উদ্যোক্তা ঝুঁকি গ্রহণ করতে রাজী থাকেন কিন্তু ব্যবস্থাপক থাকেন না। বাংলাদেশের জনগণ সামাজিকভাবে ঝুঁকি বিমুখ, এই ঝুঁকি বিমুখতা তাদেরকে বিনিয়োগে প্রণোদিত করেনা। আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, কেউ ঝুঁকি গ্রহণে রাজী থাকেন কিন্তু তার মূলধন কিংবা কারিগরী জ্ঞানের অভাব থাকে। সে ক্ষেত্রে তাকে এসকল সমস্যা মোকাবেলার সুযোগ দেয়া রাষ্ট্রের দায়িত্ব। তাই শিল্প খাতের গতিশীলতা আনার জন্য দেশে উদ্যোক্তা শ্রেণী সৃষ্টি খুবই জরুরী (Schumpeter 1978)।

রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ দেশে শিল্প বিকাশের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে আছে। এ সমস্যা সমাধানের জন্য দ্রুত ও সকল প্রতিষ্ঠানের মূল সমস্যা যেমন-ব্যবস্থাপনার

দুর্বলতা, উদ্বৃত্ত শ্রমিক, পুরোনো যন্ত্রপাতি, দুর্নীতি, ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রম ইত্যাদি দূর করার লক্ষ্যে কার্যকরী সংস্কার কমিটি গঠন করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন দৃঢ় রাজনৈতিক অংগীকার। নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকার দেশের ভবিষ্যৎ স্বার্থের কথা চিন্তা করে দ্রুত এ সমস্যা সমাধানে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।

বিদ্যুৎসহ অন্যান্য অবকাঠামোর উন্নয়ন শিল্প খাতের বিকাশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম। বিগত বছরগুলোতে বাংলাদেশে যোগাযোগ ব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হলেও বিদ্যুৎখাতে যথেষ্ট উন্নতি লাভে সমর্থ হয় নাই। শিল্পখাতের বিকাশে সরকার বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নে যত্নবান হতে পারে। দেশে কারিগরী জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে শিল্পখাতে বিদ্যুৎসহ অন্যান্য অবকাঠামোর উন্নয়ন শিল্প খাতের বিকাশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম। বিগত বছরগুলোতে বাংলাদেশে যোগাযোগ ব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হলেও বিদ্যুৎখাতে যথেষ্ট উন্নতি লাভে সমর্থ হয় নাই। শিল্পখাতের বিকাশে সরকার বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নে যত্নবান হতে পারে। দেশে কারিগরী জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে শিল্পখাতে স্থবিরতা বিরাজ করছে এবং অনেক সময় প্রচুর অর্থ ব্যয় করে বিদেশ থেকে উপদেষ্টা নিয়োগ করতে হয়। এ অবস্থার অবসানের লক্ষ্যে শ্রমের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট স্থাপন আবশ্যক।

জ্ঞান বিজ্ঞানের দ্রুত উন্নতির ফলে মানুষের ভোগের পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশ তার প্রচলিত রপ্তানীযোগ্য শিল্প সামগ্রীর বাজার হারাতে বসেছে। তাই পরিবর্তিত অবস্থার সাথে সংগতি রাখার জন্য আমাদেরকে বিভিন্ন অপ্রচলিত পণ্য উন্নয়নের প্রতি মনোনিবেশ করতে হবে। এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উৎপাদিত পণ্যের বিদেশী বাজার অনুসন্ধানে তৎপর হতে হবে। উদার বাণিজ্য ও মুক্তবাজার অর্থনীতির নামে দেশের বাজার বিদেশী দ্রব্যের দখলে চলে যাচ্ছে এবং দেশীয় শিল্পসমূহ তাদের বাজার হারাচ্ছে। তাই এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের মাধ্যমে দেশীয় শিল্পকে সংরক্ষণ করা খুবই জরুরী। শ্রমের উৎপাদনশীলতার সাথে মজুরীর ধনাত্মক সম্পর্ক রয়েছে। তাই উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধি, শিল্প খাতের গতিশীলতার কথা বলতে গেলে মজুরীর প্রশ্নকে কোনভাবেই পাশ কাটানো যায় না। শিল্পোন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় মজুরী কমিশন স্থাপন করা দরকার এবং এর সুপারিশ মোতাবেক শ্রমিকদের স্বার্থ সংরক্ষণ করা দরকার।

সর্বোপরি দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা শিল্পায়ন তথা বৈদেশিক বিনিয়োগকে আকৃষ্ট করার জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। কিন্তু স্বাধীনতা পূর্বকাল থেকে বাংলাদেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অভাব রয়েছে। এবং বর্তমানেও এ অবস্থা বজায় রয়েছে। ফলে, কোন শিল্পনীতি যথাযথভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব হয়নি। এ কারণে দেশের শিল্পখাতে দীর্ঘমেয়াদী স্থবিরতা বিদ্যমান। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন করা সম্ভভ না হলে শিল্পায়নের পদক্ষেপসমূহ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। বাংলাদেশের বৈদেশিক আয়ের অন্যতম উৎস হচ্ছে রপ্তানি খাত। এ রপ্তানী আবার শিল্প পণ্য নির্ভর। বাংলাদেশের রপ্তানি দ্রব্য বৈচিত্রহীন। গুটি কয়েক পণ্য পৃথিবীর অল্প কয়েকটি দেশে রপ্তানী হয়ে থাকে। তাই বিশ্বব্যবস্থায় পরিবর্তন কিংবা এ সকল দেশের যে কোন ধরনের অর্থনৈতিক সংকট বাংলাদেশের রপ্তানী তথা শিল্প খাতকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে থাকে। বিগত কয়েক বছরে দক্ষিণ এশিয়ায় মুদ্রা সংকট, উন্নত দেশসমূহের অর্থনৈতিক মন্দা আমাদের রপ্তানী বাণিজ্যে ঋণাত্মক প্রভাব ফেলেছে যা নিম্নের সারণী হতে স্পষ্ট।

সারণী-৫ ঃ বাংলাদেশের শিল্প পণ্য রপ্তানী ২০০০ ও ২০০১

(মিলিয়ন ইউ এস ডলার)

আইটেম	ক্যালেন্ডার বছর ২০০০ (জানুয়ারী-সেপ্টেম্বর)	ক্যালেন্ডার বছর ২০০১ (জানুয়ারী-সেপ্টেম্বর)	প্রবৃদ্ধির হার
উভেন আর.এম.জি	২৫১৪৭	২৪৩৪.৩	-৩.২
নীট আর.এম.জি	১০৭২.১	১১১৩.৩	৩.৮
হিমায়িত মৎস্য	২৯৮.৫	২১২.৫	-২৮.৮
চামড়া	১৫৭.৬	১৯৭.৩	২৫.২
পাটজাত দ্রব্য	১৮৭.৫	১৬৩.২	-১৩.০
অন্যান্য	৫২৩.৪	৫৬৯.৬	৮.৮
মোট রপ্তানী	৪৭৫৩.৮	৪৬৯০.১	-১.৩

উৎস ঃ বাংলাদেশ রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরোর ডাটাবেস থেকে সংগৃহীত।

৯.০ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নীতিমালা ও বাংলাদেশের শিল্পায়ন

১৯৮০ এর দশকে বিশ্বব্যাপী বাজারমুখী বাণিজ্য উদারীকরণ এর যে প্রক্রিয়া শুরু হয় তার সর্বশেষ ধাপ হচ্ছে ডব্লিউ. টি. ও বা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নীতিমালাসমূহ। এ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে উন্নত দেশগুলো উন্নয়নশীল দেশগুলোতে তাদের বাজার বিস্তৃত করা এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর অর্থনীতিকে চাপিয়ে রাখার কৌশল হিসেবে বিভিন্ন নীতিমালা গ্রহণ করতে থাকে এবং বিশ্ব সম্প্রদায়কে এসকল নীতিমালা পালনে বাধ্য করতে থাকে। এ প্রক্রিয়ায় বিশেষভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হবে বাংলাদেশের তৈরী পোষাক শিল্প খাত, যা এ দেশের রপ্তানী আয়ের প্রায় ৬০ শতাংশের যোগান দিয়ে থাকে। কেননা উন্নত দেশগুলো তৈরী পোষাক আমদানীর উপর থেকে কোটা তুলে দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ফলে বাংলাদেশকে অন্যান্য দেশের সাথে তীব্র প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে হবে; এছাড়া বাংলাদেশে এখনো তৈরী পোষাক শিল্পের পশ্চাদ সংযোগকারী শিল্প ব্যাপকভাবে স্থাপিত হয় নাই অর্থাৎ এ দেশকে এখনো তৈরী পোশাকের উপকরণ-কাপড় ও সুতা আমদানী করতে হয়। কিন্তু আমদানীকারক দেশসমূহ আমদানী বন্ধ করে দিয়ে নিজেরাই তৈরী পোষাকের বাজারে প্রবেশ করলে বাংলাদেশ ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হবে। তৈরী পোষাক শিল্পের অনুকূলে বাংলাদেশে শুধুমাত্র সস্তা নারী ও শিশু শ্রম বিদ্যমান রয়েছে। অতিসম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র "Globalization with a human face" এ শ্লোগানের আওতায় তৈরী পোষাক শিল্পে শ্রমমান কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণের শর্ত আরোপ করেছে। ফলে শিল্প ইউনিটসমূহ থেকে শিশু ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক নারী শ্রমিকদের বাদ দিতে হয়েছে। আবার অন্যদিকে উন্নত দেশসমূহ রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকাসমূহে শ্রমিক স্বার্থ সংরক্ষণে ট্রেড ইউনিয়ন চালু করার জন্য চাপ দিচ্ছে। কিন্তু বাংলাদেশের এক্ষেত্রে তিক্ত অভিজ্ঞতা রয়েছে। বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা হতে দেখা যায় যে, ট্রেড ইউনিয়নসমূহ শ্রমিকের স্বার্থ রক্ষা করে না বরং শিল্পের গতিশীলতার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। তাই পরিবর্তিত এ পরিস্থিতিতে বাংলাদেশকে বিকল্প শিল্পসমূহ স্থাপনের দিকে অধিক মনোযোগী হতে হবে।

১০.০ সম্মুখে করণীয়

বাংলাদেশের শিল্পখাতের সমস্যাসমূহ রাজনীতিবিদ, নীতিনির্ধারক, গবেষক কারো অজানা নয়। এ সমস্যাসমূহ সমাধান করে শিল্পখাতে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। কিন্তু এ নীতিসমূহ যথাযথ প্রয়োগ করা সম্ভব হয় নাই। ফলে শিল্পখাতে এক স্থায়ী দীর্ঘমেয়াদী স্থবিরতা বিরাজ করছে। এ স্থবিরতা দূর করে শিল্পখাতে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজন শিল্পখাতের দুর্বলতাসমূহ পুনমূল্যায়ন এবং সেগুলোর সমাধানে গৃহীত পদক্ষেপসমূহের যথাযথ বাস্তবায়ন। এর জন্য প্রয়োজন দৃঢ় রাজনৈতিক অংগীকারসম্পন্ন একটি গণতান্ত্রিক সরকার। যে সরকার দলীয় নীতির ঊর্ধ্বে উঠে শিল্পখাতের সমস্যাসমূহ সমাধানের লক্ষ্যে ব্যাপক সংস্কার কর্মসূচি পরিচালনা করবে। বহিস্থঃ কোন চাপে নয় বরং নিজস্ব বিশেষজ্ঞদের পরামর্শে সরকার সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে। আবার পরিবর্তিত বিশ্ব ব্যবস্থায় বাংলাদেশের শিল্পখাত যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে বা হতে পারে সেগুলো সমাধানের লক্ষ্যে দ্রুত এবং দূরদর্শী পদক্ষেপ নিতে হবে। এবং বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায়-আমাদের সামনে যে সকল সুযোগ আসে সেগুলো কাজে লাগানোর প্রতি অংগীকারাবদ্ধ হতে হবে। বাংলাদেশ এখনো সর্বোতভাবে কৃষি প্রধান দেশ, কৃষিখাত থেকে প্রাপ্ত কাঁচামালসমূহ বিদেশে রপ্তানী করে তুলনামূলকভাবে কম বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা যায়। কিন্তু কৃষি ভিত্তিক শিল্প গড়ে তুলে ঐ সকল শিল্প পণ্য বিদেশে রপ্তানী করা গেলে বাংলাদেশ অনেক বেশী বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারে। যা শিল্প খাতের উন্নয়নে কাজে লাগানো যেতে পারে। তাই কৃষি, শিল্প ও অন্যান্য খাতে সমন্বয় সাধন জরুরী। সর্বোপরি নীতি নির্ধারকদের অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে একটি সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে শিল্প খাতের প্রতি অধিক মনোযোগ দিতে হবে। কেবল তাহলেই শিল্পখাতের বিদ্যমান স্থবিরতা দূরীভূত হয়ে গতিশীলতা সৃষ্টির মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ সুগম হবে।

তথ্য নির্দেশিকা

আনু মুহাম্মদ- ৯৫ ঃ ***বাংলাদেশের উন্নয়ন কি অসম্ভব?*** জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশনা, ঢাকা।

ইরফান হবিব, ১৯৭৮ ঃ ***ঔপনিবেশিক আমলে বাংলা, কলকাতা*** ঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (১৯৯৭,১৯৯৮, ১৯৯৯, ২০০০, ২০০১, ২০০২) ***বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা,*** ঢাকা।

Bays et. al, 1998 : ***Bangladesh at 25 : An Analytical Discourse on Development;*** UPL, Dhaka.

Hossain et. al. 1996 : ***In Quest of Development : The Political Economy of South Asia,*** UPL, Dhaka

Kuddus et. Al. 1996 : ***Development Issues of Bangladesh;*** UPL, Dhaka

Salim, Ruhul Amin (1998), ***Industrial policy in Bangladesh*** : Asia-pacific Development Journal : 5(1) : 70-93,

Schumpter (1978) : ***The Economics of Development,*** Oxford University Press, Oxford, U.K.

Sobhan et. Al. 1991 : ***The Decade Of Stagnation*** : The State of Bangladesh Economy in the 1980's.

Zafarullah et. Al. 1995 : ***Policy Issues in Bangladesh;*** UPL, Dhaka.

সারণী প-১ ঃ ১৯৯২/৯৩-১৯৯৮/৯৯ সাল পর্যন্ত ১৯৮৪/৮৫ সালো স্থিরমূল্যে ম্যানুফ্যাকচারিং জিডিপি ও প্রবৃদ্ধির হার

	১৯৯৩/৯৪	১৯৯৪/৯৫	১৯৯৫/৯৬	১৯৯৬/৯৭	১৯৯৭/৯৮	১৯৯৮/৯৯	১৯৯৯/২০০০
ক্ষুদ্র ও কুটির	৬০৩৩.৪ (৭.৯)	৬৫২২.০ (৮.১)	৭০৬১.৯ (৮.৩)	৭৬০৯.১ (৭.৮)	৮১২৪.০ (৬.৮)	৮১৮৪.৯ (০.৭৫)	৮৬৫৯.৩ (৫.৮)
মাঝারি থেকে বৃহৎ	১৪১২২.০ (৮.২)	১৬৬২৯.৭ (১১.৪)	১৭৫৭৩.২ (৩.৯)	১৮২৭০.৪ (৯.৩)	১৯৬৬.৮ (৪.২)	২০৮০৩.৩ (৪.৪)	২১৭০৮.৬
মোট	২০৯৫৫.৪ (৮.১)	২৩১৫.১৭ (১০.৫)	২৪৬৩৫.১ (৬.৪)	২৫৮৭৯.৫ (৫.০)	২৮০৯০.৮ (৮.৫)	২৮৯৮৮.২ (৩.২)	৩০৩৬৭.৯ (৪.৮)

উৎস ঃ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০০২।

নোট ঃ বন্ধনীর ভিতর শতকরা প্রবৃদ্ধির হার।

সারণী প-৩ ঃ শিল্প খাতের প্রবৃদ্ধির হার, ১৯৭৩-১৯৯৩

	১৯৭৩	১৯৭৮	১৯৮২	১৯৭৩-৮২	১৯৮৫	১৯৯০	১৯৯১-১৯৯৩
শিল্প ইউনিটের সংখ্যা	-১৫.১৫	৬.৬৯	৬.৪৭	৪.৩৭	৫.১৯	৭.৩১	৫.৬০
স্থির সম্পদ	১৬.৯৮	১৭.৮৮	২১.৮৪	২০.৩৬	১৮.৭৮	১২.২৫	১৭.১৪
নিয়োগ	১০.৪২	৮.৯২	৩.৭২	১০.৭৬	৩.৭৫	৩.৬৪	৩.৮৫
উৎপাদন	৩২.২৫	২০.৬২	-৪৮.৭	২৩.৫২	২.১৪	৮.০৪	১০.৪৬
মুল্য সংযোজন	২৩.৪১	২৪.৭৪	-৯.১৩	৮.৮৭	-৪.৬৭	৬.৪৫	৩.৬৪

উৎস ঃ Asia-pacific Development Journal :Vol.5, No.1, June 1998 পৃষ্ঠা-৭৭।

সারণী প-২ ঃ ১৯৯২/৯৩-১৯৯৮/৯৯ সাল পর্যন্ত ১৯৮৪/৮৫ সালো স্থিরমূল্যে ম্যানুফ্যাকচারিং জিডিপি ও প্রবৃদ্ধির হার

	১৯৯৩/৯৪	১৯৯৪/৯৫	১৯৯৫/৯৬	১৯৯৬/৯৭	১৯৯৭/৯৮	১৯৯৮/৯৯	১৯৯৯/২০০০
মাঝারি থেকে বৃহৎ শিল্পের উৎপাদন সুচক	১৫৩.৮৯	১৬৩.৩৩	১৭৩.৫০	১৭৯.৩০	১৯৫.৯৪	২০৪.১৫	২১৩.০২

উৎস ঃ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০০২।

সারণী প-৪ ঃ প্রধান শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন

পণ্যদ্রব্য	একক	১০০১/৯২	১৯৯২/৯৩	১৯৯৩/৯৪	১৯৯৪/৯৫	১৯৯৫/৯৬	১৯৯৬/৯৭	১৯৯৭/৯৮
পাটজাত দ্রব্যাদি	০০০ মেঃ টন	৪১৬.০	৪৪৬.০	৪২১.০	৪২৫.০	৪০৫.০	৪০৫.০	৪০৮.০
চা পাতা	মিলিয়ন কেজি	৬০.৫	৬০.৬	৫৭.৩	৪৯.১	৪৯.৯০	৫০.১৬	৫৩.০৫
কলের তৈরী কাপড়	মিলিয়ন মিটার	৫৮.৯	৪৫.১	৩১.৬	১৭.০	১০.২৮	১০.৯০	১০.৪২
কাগজ	০০০ মেঃ টন	৮৮.৪	৮৯.৭	৯০.৯	৮২.৮	৮২.৩৬	৬৭.৫২	৪৫.৯১
পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদি	০০০ মেঃ টন	১০১৭.৩	১৩২০.৭	১১৯.৪৭	১৩৭.৩	১১৬০.০	১৩০৯.৮৫	১৪২৬.৪৪
বাবার	০০০ মেঃ টন	১৭৩৫.৬	২০৫০.৬	২৩৬৬.১	২১৪৪.৯	২২৪৮.০	১৭৭২.৬৬	২০৩০.৬৭
সিমেন্ট	০০০ মেঃ টন	২৭২.৫	২০৭.৫	৩২৩.৭	৩১৬.৪	৪২৫.৭	৬১০.৫	৫৯১.১২
চিনি	০০০ মেঃ টন	১৯৫.৪	১৮৭.৫	২২১.৪	২৭০.১	১৮৪.০	১৩৫.৩২	১৬৬.৪৪
প্রস্তুতকৃত পোষাক	মিলিয়ন ডজন	৩১.০	৩৬.০	৩৪.৩	৪৭.২	৪৮.৮২	৫৩.৪৫	৬৫.৫৯
	মিরিয়ন টাকা	৪১৩১৪	৪৮১৯.৩	৫১৪৭.২	৬৭৮৩২	৭৯৭০৬	৯৪৬৫৭	১২৩৭৫২
এস. এস. রড	০০০ মেঃ টন	৪৪.৭	৫০.৭	৯০.২	১৪৯.০	১৪০.৮৭	১৫১.৫৩	১৬১.১৪
	০০০ মেঃ টন	৪৬.০	৪৯.০	৫১.০	৪৭.০	৫১.০	৫৪.০৬	৫৮.৬১
পানীয়	মিলিয়ন ডড়ন বোতল	৮.০	১০.০	১১.০	১২.০	১০.০	৯.৪৯	১০.৯৯
সাবান ও ডিটারজেন্ট	০০০ মেঃ টন	৩২.০	৩৪.০	৩৭.০	৪৬.৫	৪৯.০	৫১.০৫	৪৭.৮৪
চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্যাদি	মিলিয়ন বর্গ মিটার	১১.০	১২.৯	১৪.৬	১৫.০	১৫.৯০	১১.৯৫	১২.১২

উৎস ঃ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ১৯৯৯।

নোট ঃ বিটিএমসি ও বিটিএমএ-এর অধীনস্ত বৃহৎ আকারের মিলের উৎপাদিত সুতা ও কাপড়।

সারণী প-৫ ঃ বাংলাদেশের পোষাক শিল্পের বিকাশ

বছর	পোষাক শিল্পের বৃদ্ধি (সংখ্যা)	প্রবৃদ্ধির হার (%)
১৯৮৪	২১০	-
১৯৮৫	২৫৯	২৩.৩৩
১৯৮৬	৪০০	৫৪.৪৪
১৯৮৭	৭৫৩	৮৮.২৫
১৯৮৮	৭৫৪	০.১৩
১৯৮৯	৭৫৬	০.২৬
১৯৯০	৭৫৬	০.০০
১৯৯১	৮০২	৬.০৮
১৯৯২	১৩০০	৬২.০৯
১৯৯৩	১৬০০	২৩.০৮
১৯৯৪	১৮৫০	১৫.৬৩
১৯৯৫-৯৭	১৭৯২	(৩.১৪)
১৯৯৭-৯৯	১৫৬০	১২.৯৫

উৎস ঃ সাপ্তাহিক বিচিত্রা ১৮ই মার্চ, ১৯৯৪ এবং লেখকের হিসাবকৃত, পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

নোট ঃ বন্ধনীর ভেতরের সংখ্যা ঋণাত্মক নির্দেশক।

সারণী প-৬ ঃ মোট রপ্তানী আয়ে পোশাক শিল্পের অবদান

সাল	মোট রপ্তানী আয় (কোটি টাকায়)	তৈরী পোষাকের রপ্তানী আয় (কোটি টাকায়)	মোট রপ্তানী আয়ে তৈরী পোষাকের অংশ (%)
১৯৮৮-৮৯	৪১৬.১	১৩৭৮.০	৩৩.৫
১৯৮৯-৯০	৪৮৯২.৯	১৯৪৯.২	৩৯.৮
১৯৯০-৯১	৫৯৫৫.৯	২৮১২.২	৪৭.২
১৯৯১-৯২	৭২৬২.৭	৩৯৬৭.১	৫৪.৬
১৯৯২-৯৩	৮৩৬৯.৫	২৮০২.৩	৫৭.৪
১৯৯৩-৯৪	৯৩৮৭.৭	৫৬৪৬.০	৬০.১
১৯৯৪-৯৫	১২৩০৮.০	৭৪৩৭.৮	৬০.৮
১৯৯৫-৯৬	১২৭২.১	৮১৮৪.২	৬৪.৩
১৯৯৬-৯৭	১৪৯৮.২	৯৮৯২.৫	৬৬.০
১৯৯৭-৯৮	১৭৯৪২.৫	১২৬১৭.৩	৭০.৩
১৯৯৮-৯৯	১৭৯৪০.৩	১২৯৭৬.১	৭২.৩

উৎস ঃ বার্ষিক রপ্তানী আয় (১৯৯০-৯১ হতে ১৯৯৮-৯৯) পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণী প-৭ ঃ ১৯৯১/৯২ ডিসেম্বর হতে ২০০০ সাল পর্যন্ত বিনিয়োগ বোর্ড কর্তৃক নিবন্ধনকৃত বিনিয়োগের পরিমাণ

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

বছর	দেশী	বিদেশী	মোট
১৯৯১-৯২	৯১	২৫	১১৬
১৯৯২-৯৩	৯০	৫৩	১৪৩
১৯৯৩-৯৪	৪৫৭	৮০৪	১২৬১
১৯৯৪-৯৫	৮৪৬	৭৩০	১৫৭৬
১৯৯৫-৯৬	১১৭১	১৫১৬	২৬৮৭
১৯৯৬-৯৭	১১০৮	১০৫৪	২১৬২
১৯৯৭-৯৮	১০৪৩	৩১৫৬	৪১৯৯
১৯৯৮-৯৯	১১৮৩	১৯২৬	৩১০৯
১৯৯৯-০০	৩৮১	২১১.৯	২৫০০
মোট	৬,৩৭০	১১,৩৮৩	১৭,৬৭৩

উৎস ঃ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, বিভিন্ন সংখ্যা।

সারণী প-৮ ঃ বিনিয়োগ বোর্ডে নিবন্ধনকৃত শিল্পখাতে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণ

শিল্পখাত	৯৩/৯৪	৯৪/৯৫	৯৫/৯৬	৯৬/৯৭	৯৭/৯৮
কৃষিভিত্তিক শিল্পসমূহ	১৬.৭	৪১.০	৪.০	১৫.৯০	৭.৯৫
খাদ্য ও খাদ্য সম্পর্কিত	৩.৪	১৩.৪	৪০.০	৪৮.৮৯	৩৪৬.৪৭
বস্ত্র শিল্প	৩৬০.৩	১৬৯.০	৭৯.০	১০৬.৯১	৯২.৭৬
মুদ্রণ ও প্রকাশনা	১.১	৫.৩	২৬.০	৯.০	-
চামড়াজাত দ্রব্য ও রাবার	৪.৯	২২.৫	১৬.০	৪.০৫	২১.০৯
রসায়ন শিল্প	৩৭২.০	১২৬.৫	৫৭২.০	১১.৬৪	৫৩.৮৫
গ্লাস, সিরামিক ও ও অন্যান্য অধাতব	১২০.১	৪৭.০	১১৫.১৯	-	৯৯.৩৯
প্রকৌশল শিল্প	২৪.১	১৭৮.০	১০১.০	২১.৩১	১০.৬২
সেবামুলক শিল্প	৯.১	৪৯.৫	১৪০.০	৫৯৬.৫৯	২২৩৭.১
বিবিধ	৪.৬	৪.১	৪৯১.০	২২.০৬	২৪৪.৬২
	৮৫০.২০	৬.৭৭৪০	১৫৫৪.১০	১০৫৩.৫০	৩১৫৬.২০

উৎস ঃ বিনিয়োগ বোর্ড রিপোর্ট ১৯৯৯।

সারণী প-৯ ঃ রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পসমুহের নীট মুনাফা/লোকসানের বিবরণ

কর্পোরেশনের নাম	১৯৯২/৯৩ (প্রকৃত)	১৯৯৩/৯৪ (প্রকৃত)	১৯৯৪/৯৫ (প্রকৃত)	১৯৯৫/৯৬ (প্রকৃত)	১৯৯৬/৯৭ (প্রকৃত)	১৯৯৭/৯৮ (প্রকৃত)	১৯৯৮/৯৯ (সাময়িক)	১৯৯৯/২০০০ (সাময়িক)
বি টি এম সি	(১৪৪.৬৫)	(১৫৩.৮৭)	(১১৭.০৪)	(৩৪.৪০)	(১৬৩.২৬)	(৯২.৭০)	(৮০.৩০)	(৫৩.০০)
বি এস ই সি	(১২৯.২০)	(১১০.২২)	(৬৮.৩৬)	(৬৪.৫০)	(১০৩.২৮)	(১১২.৪০)	(৫.১০)	(০.২০)
বি এস এফ আই সি	(৮৬.১৬)	(১৯.৬০)	২.৫৩	(৩৭.৮০)	(৬৫.২৯)	(৩৯.২০)	(৬০.০০)	(৪৮.৬০)
বি সি আই সি	২০.৫৮	২৫.৪৯	(৭৫.৪৭)	(১২১.৪০)	(২৩৭.১২)	(৬৮.৯০)	(১৪২.৪০)	(২১২.৮০)
বি এফ আই ডি সি	(১৩.২৩)	(৫.০৯)	১.১৬	৩.০০	১.৭১	(৭.০০)	(৬.৩০)	৮.০০
বি জে এম সি	(৫২৩.৩৫)	(৬০.০৫)	(৩১.৪৩)	(৯৬.২০)	(২৫১.৭১)	(২৭৫.৯০)	(২৯৫.১০)	(২৬৪.৫০)
মোট	(৮৭৬.০১)	(৩২৭.৩৪)	(২.৮৮.৬১)	(৪৫৭.৩০)	(৮১৯.৭৫)	(৫৯৬.১০)	(৫৮৯.১০)	৫৭১.১০)

উৎস ঃ মনিটারিং সেল, অর্থ বিভাগ, (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০০০)

নোট ঃ বন্ধনীর ভেতরের সংখ্যা লোকসান নির্দেশক।

সারণী প-১০ ঃ ডিসেম্বর, ১৯৯৮ পর্যন্ত রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পসমুহের খেলাপী ও মোট ঋণের পরিমাণ (ক্রমপুঞ্জিত)

(কোটি টাকা)

কর্পোরেশনের নাম	মোট ঋণ	খেলাপী ঋণ
বি টি এম সি	৬৮৩.৯৭	৬৩৫.৭৮
বি এস ই সি	৯৬৫.০৭	৮৩৭.০২
বি এস এফ আই সি	২৪৩.০১	৪৬.৩০
বি সি আই সি	২২৮.৭৬	৩৯.৭৩
বি এফ আই ডি সি	২.৬৬	০.৬১
বি জে এম সি	১৬৭৩.৪৭	২৩৭.২০
মোট	৩৭৯৬.৯৪	১৭৯৬.৬৪

উৎস ঃ বাংলাদেশ ব্যাংক (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০০০।

সারণী প-১১ ঃ মোট আমদানীতে বিভিন্ন দ্রব্যের শতকরা অংশ

সময়কাল	ভোগ্যদ্রব্য ও ভোগ্যদ্রব্য প্রস্তুতের উপকরণ	পুঁজিদ্রব্য ও পুঁজিদ্রব্য উৎপাদনের উপকরণ
১৯৭৪-৮০	৬৬.৮	৩৩.২
১৯৮১-৮৫	৬২.২	৩৭.৮
১৯৮৬-৯০	৬৮.৫	৩১.৫
১৯৯১-৯৫	৬৬.৩	৩৩.৭
১৯৯৫-০০	৬৩.৫	৩৬.৬

উৎস ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ (বিভিন্ন সংখ্যা)

ISSN 1605-2021

LOKPROSHASHON SAMOEEKY
Vol. 21,
December 2001, Poush 1408

Towards the Management of Forest in a Sustainable Way : Views from the Chittagong Forest Areas

Dr. Sultana Mustafa Khanum*

Abstract : The present paper seeks to identify the process and nature of forest depletion in south Chittagong forest areas. The paper explores the fact that encroachment, forest resource extraction, conversions of land use pattern and community involvement in forest depletion are some of the contributing factors of dwindling the forest areas. The paper also aims to contribute to involve the stakeholders, especially the local community in management of forest in a sustainable way.

Introduction

From the dawn of civilization man has started extracting forest resources to meet their needs of food, shelter and remedial measures. This endeavour has been in action till now. Continuous deforestation has been inflicting flood, natural disaster greenhouse effects creating manifold imbalance in the environment. The threat to environment and the Earth has brought the global community unite on one platform in the aim of protecting the 'Green-belt' of the world. The Rio-Declaration of 1992 is one of the outcomes of such efforts. Bangladesh also takes part in forest protection and plantation programs. In 1980 Bangladesh Forest Department took up a social forestry program with the assistance of the Asian Development Bank (Imam,

---

* **Professor, Department of Sociology, Rajshahi University**

1999). Much emphasis was given on the afforestation program in the 3rd Five Year Plan of Bangladesh Government (1985-90). A draft of National Forestry Master Plan was formulated in 1994 (Huq, 1994). The Ministry of Environment and Forestry planned for setting up the National Conservation Strategy during 1989-91 and its constitution was passed in 1991. The activities of National Conservation Strategy were not activated until 1995 when NORAD came up with the financial assistance.

The first phase of the National Conservation Strategy Implementation Project-1 continued from March 1996 to October 1997 (Bari, 1999 : 65). Research of the project were mainly based on the fauna and flora of the forest are surveyed excepting only the study conducted by the Bangladesh Center for Advance Studies (1997), which added a new dimension to work with inclusion of socio-economic aspects.

The second phase of the NCSIP-1 started in January 2001. The present paper is based on the study carried out by NCSIP in south Chittagong hill forest areas. Although Chunati, Himchari and Teknaf were included in the study areas but the emphasis was given on the Teknaf. The present paper tries to investigate the role of the local people in forest resources extraction and to find out ways to involve them in the protection and management of forests.

Objective

The objective of this paper is to identify the process and nature of forest depletion in south Chittagong forest areas. The paper seeks to explore the ways in which forest depletion could be prevented and forest resources could be managed in a sustainable way.

Methods and Techniques of Data Collection

The information was largely collected through PRA. PRAs were

facilitated by using various tools such as mapping, wealth ranking, vector scoring, time trend analysis and Focus Group Discussion based on a well-defined checklist. Information was also collect through pie diagram, bar diagram, seasonal chart drawn by the respondents. Formal interviews were also carried out with the forest Department personnel, Forest guards, Banjaigirders and person in charge of the Noyapara Rohingya Camp, Teknaf. Secondary data were obtained from the BCAS (1997).

The Sample and the PRA Sessions

Four unions were selected as sample areas, such as : Chunati (Chittagong), Himchari (Cox's Bazar), Teknaf (Cox's Bazar) and Hnilla (COx's Bazar). The sample villages were Chunati (Chunati), Ferdousnagar, Bhanamora (Him chair), Pulerdaile (Hnilla) and Naitongpara (Teknaf).

The PRA sessions were facilitated with 20-25 respondents consisting farmers, traders, land owners, school teachers, representative people, wage labourers, members of NGOs, present and ex-UP chairmen, religious leaders, local politicians and women in each of the sample areas. Hence the total sample size was 125. Both purposive and random sampling procedures were adopted to select the respondents.

The Process of Forest Depletion

The continued pressures of landlessness and unemployment as well as lack of understanding of conservation issues encourage people to take part in forest depletion. The process of forest depletion could be identified as (i) encroachment (ii) extraction of forest resources (iii) conversion of land use pattern and (iv) community involvement in forest depletion.

Encroachment

A large part of hill forest areas is encroached by the landless farmers, flood/cyclone victims and chain migrants. One category of encroachers are those who have lost their houses and/or land as a result of the construction of Marine Drive Road. This road is under construction along the western coastline, from Cox's Bazar to Teknaf. The road passed through a populated village, (having 100 households) named Ferdousnagar near Himchari. The most villagers had to be evacuated. According to villagers the Army Corps of Engineers (who are carrying out construction) told them to construct their houses in the hills, and they were forced to take shelter there. We found 35 families were living atop the hill, and were deforesting the adjoining areas. Chain migration is taking place in the hill very rapidly in the hills. The chairman of Hnilla Union Parishad, Teknaf informed us that at least 50 cases are being filed every month on the issue of taking possession right over hill/forest. Majority of the encroachers consist of landless farmers from nearby villages and thanas, but some also come here from other parts of the country as wage labourers, and are tempted to settle in the Teknaf area. A good number of refugees from Myanmar is also settled in a village-Naitong Para, which is known as Rohingya para. Besides, about 2600 hectares of forest land is used for establishment of refugee camp for Rohingyas.

Extraction of Forest Resource

People living in and around the forest areas extract different types of forest resources for different purposes, such as:

Bamboo and thatch: Bamboo and thatch are collected and used for constructing dwelling huts. These are also used for making scaffolds of betel leaves.

Food plants : Some plants, like, yams, arums, young bamboo shots are used as food.

Fodder plants : People collect fodder for their livestock and also graze the cattle inside the forest.

Medicinal Plants : The bark, leave, roots, flowers of different kinds of trees are treated as the ingredients of Ayurvedic and Unai medicine, which are extracted by the traditional healers.

Timber : The largest amount of the forest resource being extracted is timber, which is used for making furniture, cabinet, doors and windows of the houses etc. Some timbers are used as posts or poles for used under water.

Fuel wood : People use fuel wood for cooking purpose. Along with collecting the branches of trees, people also cut down big trees to collect fire wood for their own use, to sell it in the market and to meet the demand of two adjacent brickfields.

Conversion of Land Use Pattern

It has been noted that the encroacher farmers gradually expanded their agricultural fields into adjacent forest land (khan and khan, 1991). As a result the forest plants are being replaced by the agricultural products, like: paddy, betel leaf etc. One of the reasons of conversion of forest land into agricultural land is lack of arable land in the plain land areas in South Chittagong, especially at Teknaf. There are 21517 acres of land, which has brought under cultivation representing 45% of the total effective land area. At Teknaf, there is only 13% of cultivable land representing 2993 acres, which are used as permanent crop area. The agricultural land use pattern is apparent from the following Table:

Table-1 : Agricultural Land Use Pattern

Land use Pattern	Land in acres
Effective Area	47372.57
Cultivable Area	21517 (45%)
Permanent crop Area	2993 (13%)
Irrigated Area	3562 (16%)

(Source : BBS, 1998, data obtained from BBS, Teknaf)

By the early 1990s 10% of the reserve land has converted to agricultural land (Choudhury, 1993; Rosary, 1997) by the people who shifted their dwelling to the forest areas. Moreover, a vast area of forest have been acquired for the construction of roads and development of infrastructures.

Community involvement in Forest Depletion

The people from different sectors of the community play different roles in forest depletion. The main ones discussed below are the poor villagers, timber traders/smugglers, banjaigirders (Forest Villagers), local political elites and Forest Department Staff.

The Poor Section of the Village

The poorest of the locality extract forest resources for their survival. Basically, Teknaf is one of the most poverty striken areas of Bangladesh. Insufficient arable land as compared to its population and paucity of irrigation facilities yield lesser crops and lesser work. Earlier the forest was a source of income. However in 1983 a ban was imposed on extraction of timber from all natural forests in Bangladesh until the year 2003, resulting in greatly reduced earnings, in the face of ever increasing population pressures. As a result, the forest failed to continue to provide them with necessary income. The women remain out of

work force, mainly because of strict religious reasons, but also because of a lack of opportunities. Finding no other source of income a large group of people earn their livelihood by extracting fuelwood and selling them to the markets several miles away in order to procure their basic needs. They also work for the timber smugglers as day labourers. Beside their own consumption, erecting houses, some of them have started constructing their houses in the forest, on hilltops. Nevertheless the poor extract forest resources to meet up their basic necessities.

The Timber Traders and Timber Smugglers

With a limited quota the timber traders extract unlimited quantity of timber. Beside, the timber smugglers utilise wage labourers for illegal felling and smuggling timber from the forest. Along with scattered, incidental felling, this activity is also done in a large scale and organized way. According to the PRA respondents these traders/smugglers bribe the personnel of the Forest Department for this purpose. When these gangs are challenged by the forest guards they resist it by using weapons, and often employ armed hoodlums to ensure their protection. In order to carry on such illegal felling, the traders/smugglers make payments to labourers employed, armed terrorists, personnel of the forest department and sometimes local influential persons in the area. The PRA respondents strongly opined that without the help of forest department, it is impossible to smuggle timbers from the forest. A proverb is common there 'Rakshake Bhakkak' (i.e., the protector himself is the grabber.')

Banjaigirdar (Forest Villagers)

There are 20-50 banjaigirder (informal forest guards) in each village. Each banjaigirder has been provided with about 2-5 acres of land, in return for which they are to take care of part of forest, adjacent to his house. These jaigirders are caught in a

web. On the one hand, they cannot not prevent their poor relatives, neighbours from extracting forest resources due to kinship obligation and on humanitarian ground. On the other hand, they can not resist the armed terrorist (thugs) employed by the traders/smugglers because of their self insecurity. These jaigirders sometimes claim a toll from the illegal fellers and sometimes they act as go between for bribes between the illegal fellers and the Forest Department staff. Officially, the system of banjaigirder has been abolished, but at a local level it has not yet been dismantled.

Local Leaders and Chairman of Union Parishad

Local leaders, with affinities to various political parties, and the UP Chairman cannot resist these traders, smugglers, labourers and poor people for felling down of the trees, for in doing so, they would lose their votes and may be replaced after the next elections.

Forest Department

According to the PRA respondents the personnel of the Forest Department are responsible for the illegal felling of the trees. In their views without their involvement it is impossible to dispatch huge quantities of timber out the forest zone. On the contrary, the staff of the Forest Department have pointed out the constraints to safeguard the forest resources and plantation, which include: as per volume of work, i.e, guarding the total area, as directed, number of staff is not enough. As a result, they need to make surveillance area every night which is not only difficult but also impossible. For example, the Beat Officer together with the guards needs to cover an area of 5000 ha. every night for surveillance. As a result, they cannot discharge their duties as per schedule. Their statement claims authenticity if we have a

look at the list of Forest staff responsible for safeguarding the forest at Head Quarter Beat Office. The list indicates that there is one Range officer, one Beat Officer, one Probationary Beat Officer, two guards, two gardeners and two speed boat drivers at a Beat office.

Moreover, the Beat Officers are not provided with 4-WD vehicles. Motorbike is allocated only to the Beat Officers for patrolling the forest areas while the cost of required fuel and lubricants of the bikes is to be borne by them. The area to be looked after at a Head Quarter Beat Office is 10000 ha. every night. The Forest Guards are provided with arms, which are not sophisticated enough to combat the miscreants because the latter are usually armed with more advanced weapons. Moreover, when the illegal fellers are captured by the forest guards/staff, the accused are to be taken to the police/court for prosecution at their own cost. In such cases the travel cost, court fee etc. are to be borne by the FD staff.

In terms of plantation, the amount of money given to the Forest Department is too little to manage the programs successfully. According to the view of some of the Beat Officers the Government allocates Tk. 8000 for the planting and maintenance of 1.0 ha. of seedling which is far below the present minimal requirement of Tk. 15000 per ha.

However, beside these stackeholders there are some sectors/ organizations, which could be regarded as stackeholders since these are closely involved with the activities, related to the forests/plantation programmes. These sectors are: Ministry of Establishment, Ministry of Land, Ministry of Environment and Forestry, Bangladesh Forest Research Institute, Bangladesh Water Development Board, World Bank, Different NGOs etc. Their involvement and roles are apparent from the following Table :

Table-2 : The Activites and Current Role of Stakeholders

Stakeholders	Current Role	Activities at Teknaf
Ministry of Establishment and Ministry of Land	Involved via District Administration	Issuing permits for legal tree felling through Deputy Commissioner; Allocate khas lands for expansion of forest to relevant Departments and individuals concerned.
Ministry of Environment and Forestry	Implement programmes for the protection and development of forest resources	Protection of wildlife through Game Reserve, plantation
Forest Department	Management and protection of state forests and social forestry activities outside the Government owned forest areas; Improving wood supply to established industries; Establishment of Domestic wood plantation to meet up the requirement of population	Raising plantation; Cutting trees under legal felling and selling through auction;
Bangladesh Forest Industries Development Corporation	Raising and managing Rubber plantation; Development of wood based industries	Not in action
BARC	Coordinating research activities through the agencies involved in the filed of agrod forestry	Not in action

Stakeholders	Current Role	Activities at Teknaf
Bangladesh Forest Research Institute	Conducting Research in Forest products and Forest Management.	Not in action
BCIC	Extraction of fibrous raw material from forest allotted to them.	Not in action
NGOs, Namely BRAC, ASA, PRSHIKA, SWANIRVAR	Engage in Social Forestry, Community Forestry, Homestead Forestry; Motivating and providing support to raise plantation with peoples participation and benefit sharing mechanism.	BRAC has initiated their programmes
World Bank	Participatory Forestry Development	
Bangladesh Water Development Board	Plantation alongside the embankment, rivers etc.	Planting alongside the embankment
Local Villagers		Extracting forest resources as a source of income
Banjaigirders	Look after the forest around and adjacent to their houses.	Fail to protect forest under their jursidiction due to their insecured position as well as kinship obligation.

Conclusion and Recommendation

The stakeholders mainly belong to two sections: (a) Local villagers who extract forest resources (b) The organizations involved in protecting forest resources. The latter cannot be successful in their endeavours unit the local people can be deterred from extracting forest resources. Introduction of severe punishment, motivation and developing awareness-are all theoretical approaches to achieve this, but they cannot be fruitful unless the alternative income generating activities for the livelihood of the local poor can be identified and implemented. The poor do not extract forest resources spontaneously. They bring very little money home through this sort of risky, tedious and labourious work. Under such circumstances the organization involved in forest management can also act as job providing bodies for the local people. The main stakeholders in the management of the Teknaf are the Forest Department and the local communities. Secondary stakeholders are the Local Government, Army Corps of Engineers, Local businessmen and local NGOs. In addition, there are roles for minor stakeholders such as BFRI, BARC, BFIDC, BWDB, LGED and the Ministry of Fisheries and Livestock.

Involvement of Stakeholders in Forest Management

Some of the organizations can take up programmes to meet up villager's basic necessities. The organizations can take up some endeavours in this regard, such as:

Tabel-3 : The Potential Roles of the Stakeholders in Forest Management

Stakeholders	Responsibilities to be carried out
Forest Department	FD should involve local people in plantation programme carried out by the FD on benefit-sharing mechanism. In addition to this long term scheme, the local people should be engaged in maintenance of the seedlings, saplings and trees on monthly salary/daily contractual basis. This will help develop:(i) and occupation for livelihood (ii) protection of trees at local people's own initiative once the participatory forestry based on benefit sharing mechanism is reached to an agreement between the local people concerned and the FD. (iii) alleviate poverty and certainty of income will decrease the rate of extracting forest resource (iv) ensuring protection of the forest trees in association with the growing tender ones.
Bangladesh Forest Research Institute	BFRI can innovate ideas for the feasibility of cultivation of crops in the hill forest areas. They can take up trial programmes for cultivating tea, pineapples, keseaunuts etc. Feasibility of tending hill goats (imported from Afghanistan, Pakistan), apiculture etc. are to be the potential areas of research. Local people can be engaged as labour power.
Bangladesh Agriculture Research Council	BARC can invite proposal and Finance for research project (the areas mentioned above) and provide the opportunity to carry out projects in the hill forest areas. Can initiate hill top irrigation facilities by adopting 'fog trapping' and 'percolation strategy' of irrigation adopted in Chillie and Brazil respectively.
Bangladesh Forest Industry Development Corporation	Beside rubber and timber extraction, BFIDC can extend its activities towards the establishment of microindustries connected with pineapple, honey, keseaunuts processing and provide jobs to the local people.

Stakeholders	Responsibilities to be carried out
Bangladesh Water Development Board	BWDB can involve local people in offshore plantation and that being carried out on the embankment on benefit-sharing mechanism. They can employ local people on monthly salary basis to look after and monitoring the saplings planted.
NGOs	The NGOs can motivate people and provide financial assistance to help develop planting fruit trees/timber yielding trees beside ponds and grass for fodder in gopat, along with existing social forestry. Beside forestry they can extend loan facilities in other income generating sectors and can provide facilities in health, education, sanitation etc. sectors. In the poverty alleviation programme part of the management plan, they can play a role as local mediators, by assisting local villagers with the formulation of proposals for the WB-funded SIPP.
International Organizations	Allocate financial assistance and expertise for successful implementation of such activities.
Local Community	Participate in protection and development of forest resource through Local Forest Protection Team (viz next section)
Local Government Engineering Department	LGED can establish cluster villages for providing accommodation to flood victims, migrants and local people to resist encroachment, can provide works in construction.
Ministry of Fisheries and Livestock	Can set up hatcheries, initiate fish culture in local charras.

Involvement of Local Community in Preservation of Forest

In order to ensure local community's involvement in forest management, it is proposed that a two-tier 'Local Forest Protection Team' be established at every union level. The lower tier of the team could be set up in every forest range consisting of representatives from each class of the locality including local elites from each sector (i.e., politician, religious leader, school teacher, influential businessman etc.) and Forest Range Officer. Each member of the team woud receive monthly remuneration.

The upper-tier of the team should consist of Union Parishad Chairman, the local Range Officer of the FD, representative nominated by the lower tier of the LFPT, representatives of the Deputy Commissioner's Office, representative of the NGOs, member of the summery court.

The LFPT could set up two or three surveillance teams, consisting with the jobless youths of the locality. These teams are to work in close association with the forest guards, in rotation for patrolling the forest. Members of such teams can be employed on a master roll. The surveillance teams should be armed in order to be able to challenge the terrorist illegal fellers. This team should be remunerated for every operation completed, and perhaps a share of the proceeds obtained out of the sale of recovered timber. The illegal feller thus captured should be tired in summery courts, established by promulgating laws by the Parliament Members. In any case the penalties should be very high (i.e. at least ten years imprisonment, seize of property etc.) The summery court will consist of representatives from the LFPT. Surveillance teams should also be motivated by disincentives, for example, if any trees are illegally felled on a particular day, the members of this surveillance team responsible on that day may lose the income they would otherwise obtain for that particular day, or they should be terminated from their duties. This will develop mutual surveillance between the teams and ensure a

degree of accountability. The FD personnel, local UP chairman, leader of the surveillance team will inspect the forest once a month to observe whether there has been any illegal felling. The concerned team/team members shall have to be prosecuted on the spot.

An incentive mechanism may be introduced by rewarding one team from each Thana/District on the basis of the performance of that team for stopping encroachment, preventing illegal felling of the trees, protecting seedlings etc. The team would be accountable to Samaj/panchayet as well as to the Forest Department.

The LFPT will also contribute to implement participatory forestry, community forestry, homestead forestry involving local people on benefit-sharing mechanism in collaboration with FD, BWDB, NGOs. The team can maintain liaison between the villagers and BFIR, BFIDC etc. In order to stop encroachment the Local Government Engineering Department can establish cluster villages by determining boundaries of areas that are to be serviced by education, health, electricity etc.

The recommendations have been made which may open up opportunities of work for the jobless utilizing the locally available resources. At the same time, it includes the assurance of participation of the local people in existing power structure. This empowerment provides legal approval to convey punishment to an influential illegal feller if the charge has been proven. Similariy, the participatory forestry, based on benefit-sharing mechanism would not only provide them with financial benefit also it will purgrade their position by providing them with shared ownership of the trees. Once the economic and social status is ensured, or the assurance of obtaining such status would inspire them to maintain the saplings/trees. Besides, the people who will be appointed on salary basis to look after the trees and the members of the surveillance teams will be provided with a source

of income. If implemented, the recommendations indicated will help alleviate poverty, safeguard the forest, contribute to sustainable development, and help to decrease class differences in the community.

References

Bangladesh Population Census (1994), Bangladesh Bureau of Statistics, Ministry of Planning, Government of Bangladesh, Dhaka.

Bari, A. (1999), ***Reports on Crops, Forestry, Fisheries and Livestock Sub-Sectors for Integration of National Conservation Strategy Recommendations into National Economic Planning,*** NCSIP-1, Minister of Environment and Forest, Government of Bangladesh.

BCAS (1997), ***Demographic and Socio-economic Survey : Final Report Bangladesh Center for Advanced Studies,*** Ministry of Environment and Forest, GOB, National Conservation Strategy Implementation Project 1, Dhaka, 148 pp.

Choudhury, J. H. (1993), ***Draft Revised forest Management Plan for Cox's Bazar Division, 1991-92 to 2000-2001.*** Vol. 1. Bangladesh Forest Department, Working Plans Division, Chittagong, 118 pp.

Huq, M. F (1994), ***VFFP, government Policy and Forestry Master Plan*** (mimeo) Dhaka

Imam, M. H. (1999), ***Samajik Banayan : Unnayan Prachesta Anyannwo Prashango in Hossain, K. T. and Imam,*** M. H (eds) Bangladeshi Gram, Social Science Development Center, Dhaka.

Jordan, J. (1992), IUCN ***Directory of South Asian Protected Areas.*** Compiled by M. J. B. Green, World Conservation Monitoring Center and IUCN Commission on National Parks and Protected Areas for UNHCR PTSS Geneva, September 1992, 93 pp.

Khan, A.M. and Khan, M (1991), ***Protecting the Forest : The Experience of Non governmental Organizations in Bangladesh.*** Information Pocket for 9th Agroforestry Working Group Meeting, BRAC

ISSN 1605-2021

LOKPROSHASHON SAMOEEKY
Vol. 21,
December 2001, Poush 1408

The Concept of Sustainable Development : Weights on Improving Saving Rates and Protecting Environment.

Md. Moniruzzaman *

Abstract : The issues of 'sustainable development' concept can be views as non-declining production and consumption paths of an economy with finite stock of exhaustible resources and the optimal resource allocation path over time. Different definitions carry different weights regarding improvements of saving rated and environmental protection with an objective to achieve sustainability. The sustainability concept has come as major concern in mainstream economics with the development of ecological science and the emergence of environmental science and with development of environmental economics. Sustainability as non-declining utility or non-declining consumption through time implies some ethical norms of intergenerational equity. Now donors are more interested in sustain ability criterion as one of conditions of providing grants and loans to poor and developing countries. Sustainable development means non-declining per capita human well-being over time. Non-declining utility or non-declining consumption indicates intergenerational equity, which is the key issue of achieving sustainability. We cannot offset the exhaustion of 'critical natural resources' by any form of capital accumulation. Savings are important for sustainability because increased savings decreases interest rate and lower interest rate implies lower rate of resource depletion. The sustainability policy and environmental policy should be consistent that a country can maintain non-declining consumption and environmental quality over time.

Introduction

The concept of 'sustainable development' or 'sustainability' has become more demanding rather than 'economic growth' or 'economic development'. The definition of economic growth refers

---

* **Senior Assistant Secretary, Ministry of Commerce**

to an increase of Gross National Product (GDP) or per-capita gross national product and it does not imply whether the growth is sustained over time and what is the impact of growth and development on environment. Generally, sustainability means continuation of an action or process through time. A sustainable economic or environmental state is one in which concerned variables should continue to exist over a defined period of time. The issues of 'sustainability' concept can be viewed as non-declining production and consumption paths of an economy with finite stock of exhaustible resources and the optimal resource allocation path over time (Permian et al., 1996, 51). It is a very though task to define 'sustainability' in terms of a unique or single definition because it can be interpreted from various point of views regarding economic, ecological and environmental and social aspects of sustainability. In real world, we observe very complex interaction phenomenon between economy and environment. The definitions of sustainability as given by economists, ecologists and environmental scientists carry different weights (emphasises) with key policies to attain sustainability. Some definitions give more weight on improving savings rate while some other definitions put more concern on environmental protection. However, different definitions carry different weights regarding improvements of saving rates and environmental protection with an objective to achieve sustainability.

This paper attempts to analyse how different definitions have placed different weights for achieving susainability. Section I is an introduction, Section II deals with a brief background and conceptualization of sustainable development. Section III analyses sustainability weights on improving saving rates and protecting environment and Section IV is the conclusion.

2. Background and Conceptualization of Sustainable Development.

The 'sustainable development' or 'sustainability' concept has

d. Sustainable yield of resource services

e. Maintenance of ecosystem stability and resilience.

Sustainability as non-declining utility or non-declining consumption through time implies some ethical norms of intergenerational equity. Hartwick and Solow emphasized on this criterion to interpret sustainability. But the crucial thing is that what are the conditions for maintaining non-declining consumption over time.

The concept of sustained yield of resource services refers to renewable resources where a minimum level of resource stock should be maintained to get a constant flow services over time. Ecosystem stability incorporates a broader sense where the whole system the biosphere works. This concept implies minimum disturbance can be allowed to maintain a stable ecosystem.

3. Sustainability Weights on Improving Saving Rates and Protecting Environment.

Economist, ecologists and environmentalists define sustainability from different point of justifications as they observe and put different weights sustainability weights on improving saving rates and protecting environment. Some of the important definitions are discussed here. Jacob's (1991, 312) defined sustainability as the maintaiand and of production capacities, at level which at least prevent depletion (extinction) and which at most give future generations the opportunity to enjoy a measure of consumption equal to that of the present generation. Tietenberg (1994, 432) defined sustainability as 'at a minimum, the average individual in future generations should left no worse off than the average individual in current generations. Sustainable development means non-declining per capita human well-being over time (Pearce et al., 1989, 37).

Non-declining utility or non-declining consumption indicates intergenratinal equity, which is the key issue of achieving sustainability. Rawl's (1971) concept about intergenerational

justice mentioned in Solow (1974,29) as "...the question of justice between generations... Subjects any ethical theory to severe if not possible test...I believe that is not possible, at present anyway, to define precise limits what the rate of savings should be.. Thus the utilitarian doctrine may direct us to demand heavy sacrifices of the poorer generations for the sake of greater advantages for ones that are far better off. It is now clear why the (maxi-min. criterion) does not apply to the savings problem. There is no way for the later generation to improve the situation of least fortunate first generation'. Actually the 'maxi-min' principle poses a deep ethical values, and savings and investment decisions of present generation largely depends on how much it has got from its ancestors and how much is should leave for its descendants.

The present generation should use resources especially non-renewable resources in such a way that there remain the production or consumption opportunities for the future generations. Hartwick's rule, known as savings rule simply states that all the rents extracted from resource exploitation should be reinvested. John Hartwick (1977 & 1978, 972-974 & 347-354) demonstrated that if we invest the rent revenues collected from the use of exhaustible resources and the resources are extracted efficiently, then it is possible to maintain constant consumption over time.

A simple proof of Hartwick's Rule:

Assume a very simple closed Economy where the following two rules work:

Hotelling Rule : $F_K = \dot{F}_R / F_R$

Hartwick Rule : $\dot{K} = R\,F_R.$

From Macro-economic National Income Identity, we know Y=C+I where Y = Output which is defined by production function Y=F (K,R). Here K=Man-made capital and R=resource flows. I=Investemnt difined by I=K. From this relationship we get:

$$C = F(K,R) - \dot{K}$$

$$\dot{C} = F_K\dot{K} + F_R\dot{R} - \ddot{K}$$

$$\dot{C} = F_K\dot{K} + F_R\dot{R} - \dot{F}_R R - F_R\dot{R}$$

$$\dot{C} = F_K\dot{K} - \dot{F}_R R$$

$$\dot{C} = F_K F_R R - F_K F_R R$$

$$\dot{C} = 0$$

So constant consumption can be maintained.

Ramsey rule for a very simple economy is defined as:

$$F_K = (-\dot{\phi} / \phi) + \dot{C} / C\eta(C)$$

Where U (C) is utility function (consumption is the only argument of the utility function), $(\dot{\phi} / \phi)$ is the utility discount rate. F_K is marginal return of capital, which is come from deferring a unit of current consumption (saving).

$\dot{C}$ /C=Growth rate of consumption, η (c)=Marginal elasticity of consumption

So, the gain from saving is equal to cost of saving in economy's optimal path (PV-optimal path). We can now derive from Ramsey rule mentioned above:

$\dot{C} / C = [F_{k-} \dot{\phi} / \phi] / \eta(C)$ as long as $F_K > \dot{\phi} / \phi$ the economy can enjoy positive consumption through time.

Solow (1986,1991) emphasized on the maintenance of production opportunity for future generation in terms of the so-called 'cake eating' problem. Costanza et al (1991-1-20) called this minimum savings and investment as the minimum necessary condition for sustainability. We cannot offset the exhaustion of 'critical natural resources' by any form of capital accumulation (Common 1995, 348). Savings are important for sustainability because increased savings decreases interest rate and lower

interest rate implies lower rate of resource depletion. However El Serafy(1989) argued that'.. in real economies the resource rents are rarely reinvested, i.e. the utilization of non-renewable natural resources is often unsustainable.

One way to achieve sustainability in terms of constant consumption is to maintain total capital stock unchanged. If we use non-renewable resources, we have to compensate for in and rent or compensation should be invested in reproducible capital. Barbier and Markandya (1990, 659-669) suggested that a minimum positive level of natural capital should be maintained in order to prevent ecological catastrophe.

Pezzy (1989, 323) defines sustainablity as "... non declining utility of a representative member of society for millennia in to the future." This definition emphases utility that should not be declined througth time. But the problem with measurement of utility is that preferences vary with time places and individuals. The definition given by Barbier and Markandya (1990, 659) is "Sustainable activity is... that level of econmic activity which leaves the environmental quality level intact... maintaining the services and quality of natural resources over time". This definition provides the importance of environmental protection in terms of environmental quality level intact. This definition indicates the strong approach of sustainability where the current generation should choose the economic activity that would not harm the environment quality. Pearce et al (1989, 37) defines sustainability as "the alternative approach (to sustainable development) is to focus on natural capital assets and suggest that they should not decline through time". The strong approach highlights the importance of environmental protection.

Solow's definition (1986, 141) mentioned in Pezzey (1989, 67) "..a society that invest in reproducible capital the competitive rents on its current extraction of exhaustible resources, will enjoy a consumption system constant in time..this result can be interpreted as saying that an appropriately defined stock of

capital-including the initial endowment of resources-is being maintained intact, and the consumption can be interpreted as the interest on that patrimony". This definition emphasizes on savings implying that the current generations should save for the future and also provides condition of maintaining resource base intact, which in turns a condition for environmental protection. Solow's idea is more or less similar with that of Hartwick. But the problem is with patrimony as a right or value. How to define how much we leave for future generations and the problem is with future preferences. This definition does not include technology and population growth.

Repetto (1985a, 10) defines sustainability which mentioned in Pezzey (1989, 67) as "The core of the idea of sustainability, then, is the concept that current decisions should not impair the prospects for maintaining or improving future living standards...This implies that our economic systems should be managed so that we live off the dividend of our resources, maintaining and improving the asset base. This principle also has much in common with the ideal concept of income that accountants seek to determine; the greatest amount that can be consumed in the current period without reducing prospect for consumption in the future". This definition provides the idea that the current generation's consumption is constrained by the future generation's consumption and the present generation should save to invest for the future so the economic systems are managed as to maintain and improve asset base. But this approach indicates weak sustainability, as it does not mention specification of man-made asset and natural capital asset.

Barbier (1987, 103) defines sustainable economic development (mentioned in Pezzey, 1989, 63) as" ... The concept of sustainable economic development as applied to the third world...,..is therefore directly concerned with increasing the material standard of living of the poor at the 'grassroots' level which can be quantitatively measured in terms of increased food, real income, educational services, health-care, sanitation and water

supply, emergency stock of food and cash, etc...In general terms, the primary objective is reducing the absolute poverty of the world's poor through providing lasting and secure livelihoods that minimize resource depletion, environmental degradation, cultural disruption and social instability".

This definition highlights economic, environmental and social sustainability, which is a global concern about poverty among the nations and environmental protection and social instability. Environmental degradation of a country is not a problem for the country but also the problem for other country.

It we consider maximization of present discounted value (PV) of social utility at a constant or at a non-constant discount rate, then the question arises whether the PV-optimal paths are sustainable or not. In Dasgupta-Heal (1974, 3-28) economies as defined by the characteristics with human made capital stock, non-renewable resource stock, constant population and no technical progress, it is found that PV-optimal consumption path shows only a single peak and moves to zero consumption which in turn imply that future generation will suffer. The basic model proposed by Stiglitz (1974, 124) :

The production function of the economy is of Cobb-Douglas type:

$$Q = F(K, L, R, t) = K^{\alpha} L^{\beta} R^{\gamma} e^{\lambda\tau} \; [a + b + \gamma = 1]$$

Where Q=aggregate output, K=Capital, L=Labour Supply, R=rate of resource depletion. After algebraic manipulation he showed that the growth rate of output is as:

$$\dot{Q} / Q = a\dot{K} / K + \beta \dot{L} / L + r\dot{R} / R = \lambda$$

He showed that the efficient resource depletion rate must satisfy the condition:

FK=d inR/dt which implies that marginal return on capital must be equal to the rate of change of the marginal product of the natural resources. He analysed the efficient and optimal growth paths with exhaustible natural resources where he showed

constant consumption path and proved some propositions. We mention four of the propositions as follow:

(i) 'Any path for which consumption grows at a constant rate must asymptotically have a constant savings rate, at constant rate of change of input of the natural resource and a constant resource flow- stock ratio.'

(ii) 'An increae in the savnigs rate increaes the growth rate, increases the asymptotic capital output ratio and is associated with a lower rate of resource utilisation'

(iii) 'If the rate of population growth is positive, necessary and sufficient condition for sustaining a constant level of consumption per capita, is that the ratio of the rate of technical change to the rate of population growth must be greater than or equal to the share of natural resources'

(iv) 'A necessary and sufficient onditon for a constant level of consumption with no technical change and no growth is that the share of natural resources be less than the share of capital'.

Goodland and Ledec (1987, 36-37) mentioned in Pezzey (1989,64) emphasized on both savings in terms of constant consumption and environmental protection as they defined "A primary goal of sustainable development is to achieve a reasonable (however defined) and equitably distributed level of economic well-being that can be perpetuated continually for many human generations." And "... Sustainable development implies using renewable natural resources in a manner which does not eliminate or degrade them, or otherwise diminish their usefulness for future generations". In terms of environmental protection, we can design inter temporal planning for exhaustible resources. The crucial thing is that the importance of the resources concerned in the production process. The elasticity of substitution between man-made capital and exhaustible resources indicated the essentiality of resources in the production process.

When we define sustainability as maintaining safe minimum standards then we have to emphasis on (i) the present generations have no knowledge about the preferences of the future generations and this uncertainty leads the preservation option, (ii) there are uncertainty about the ecological process and (iii) the intrinsic value of species and natural phenomena (Salmi 1996, 3).

4. Conclusion.

The above discussion reveals that different definitions provide different weights on improving savings rate and environmental protection. The crucial thing is that both savings and environmental protection are needed for achieving sustainability. Savings are necessary for investment in reproducible man-made or physical capital to maintain the total capital stock intact. Environmental protection is needed to prevent ecological catastrophe and to maintain eco-system stability. When we define sustainabiltty we should consider real world's uncertainty and technological progress and population growth. The policy formulation regarding sustainability should incorporate both savings and environment. But the trade off between the two depends on the country' level of economic development and the levels of resource stocks. The sustainability policy and environmental policy should be consistent that a country can maintain constant consumption and environmental quality over time. However, what should be right weights, it may be the subject matter of future research and studies in third field.

References:

Barbier, Edward B. & A. Markandya 1990. ***The conditions for achieving environmentally sustainable development.*** European Economic Review 34 (32) : 659-669.

Barbier, Edward B. 1987. ***The concept of sustainable economic development,*** Environment Conservation, 14 (2), 101-110.

Common, Michael. 1995,m ***Sustainability and policy : Limits to Economics.*** Cambridge University Press, Sydney. 348

Costanza, Reboot, Herman E. Daly & Joy A. Bartholomew 1991. ***Goals, agenda and policy recommendations for ecological economics in Robert Contains*** (ed). Ecological economics: the science and management of sustain ability. Columbia University Press, New York. P.1-20

Dasgupta, Pariah. and Heal, Geoffrey, 1974. ***The Optimal Depletion of Exhaustible Resources,*** Review of Economic Studies, Vol. 41, Symposium on the Economics of Exhaustible Resources, 3-28.

EI Serafy, Salah 1989. ***The proper calculation income from deplorable natural resources.*** In : Y.J. Ahmed, S. EI Serf & E. Lutz (ed). Environmental accounting for sustainable development. World Bank, Washington DC. P. 10-18.

Goodland, R. and Ledec, Gm, 1987, ***Neoclassical Economics and Principles of Sustainable Development,*** Ecological Modeling 38, 1946

Hartwick, John M., 1977, ***Intergenreatinal Equity and the Investing of Rents from Exhaustible Resources,*** American Economic Review 67(5), 972-974.

————1978, ***Substitution among Exhaustible Resources and Intergenerationl Equity,*** Review of Economic Studies 45, 347-354

Jacob's, Michael 1991. ***The green economy : environment, sustainable development and the politics for the future,*** Pluto Press, London. 312.

Permian, Roger, Ma Yew and McGilvray, James, 1996, ***Natural Resource and Environmental Economics,*** Long man, London and New York.

Pezzey, John C.V. 1992, ***Sustain ability : an interdisciplinary guide,*** Environmental values 1, 321-362.

———. 1989, ***Economic Analysis of sustainable growth and sustainable development, Environment Department,*** WP 15, World Bank, Washington, DC.

Rawls, John. 1971, ***A theory of justice,*** Harvard University Press, Cambridge, MA.

Repetts, Robert, 1985a, ***The global possible Resources,Development and the new Century,*** Yale University Press, New Haven.

Salmi, Jerky. 1996, ***Economics of sustain ability : Neo-Classical Viewpoint,*** http/www/hkk.fi/oppimateriaali/semmat/sust.html.

Solow, R. M. 1986, ***On the Intergenerational Allocation of Natural Resources,*** Scandinavian Journal of Economics, 88 (1), 141-149.

———1974, ***Intergenerational Equity and Exhaustible resources.*** Review of Economic Studies, Vol. 41, Symposium on the Economics of Exhaustible Resources, 2945.

Stiglitz, Joseph, 1974, ***Growth with Exhaustible Natural Resources; Efficient and Optimal Growth Paths,*** Review of Economic Studies, Vol. 41, Symposium on the Economics of Exhaustible Resources, 123-137.

Tietenberg, Tom 1994, ***Environmental economics and policy,*** Harare Colleens College ublishers, New York, 432.

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

বিক্রয়যোগ্য প্রকাশনার তালিকা

নং	বইয়ের নাম	লেখকের নাম	মূল্য
১।	অর্থনৈতিক অগ্রগতি বিশ্লেষণ, ১৯৬৪	– ডব্লিউ. ডব্লিউ রসটো	টাঃ ৬.৫০/-
২।	প্রশাসনের বিভিন্ন পদ্ধতি ১৯৭০	যাহিদ হোসেন -সম্পাদনায়	টাঃ ৬.৫০/-
৩।	প্রশাসনের মূলনীতি ১৯৭১	যাহিদ হোসেন -সম্পাদনায়	টাঃ ১৮/-
৪।	প্রবীন প্রশাসকের অভিজ্ঞতাঃ স্মৃতিচারণ ১৯৮৪	নীলুফার বেগম-সম্পাদনায়	টাঃ ১৮/-
৫।	সরকারী কর্মকান্ডে মহিলা নির্বাহী বিকাশের সমস্যা ১৯৮৭	নীলুফার বেগম	টাঃ ৬.৫০/-
৬।	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে মহিলা ১৯৮৮	এ, কে, এম হেদায়েতুল হক ও হীরালাল বালা	টাঃ ১২০/-
৭।	সামাজিক গবেষণা পদ্ধতি ১৯৯৪	নাসিরউদ্দীন আহমেদ ও আ, ক, ম, মাহবুবুজ্জামান, সম্পাদক	টাঃ ১২৫/-
৮।	বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা পঞ্চম বর্ষ সংখ্যা, নভেম্বর	বণিক গৌর সুন্দর	টাঃ ৪০/-
৯।	Bangladesh Journal of Public Administration Volume VII Number 1 & II	ড. মীর ওবায়দুর রহমান সম্পাদক	টাঃ ৪০/-
১০।	লোক-প্রশাসন সাময়িকী সপ্তদশ সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০০	মোঃ শফিকুল হক -সম্পাদক	টাঃ ১৫/-
১১।	The Deputy Commissoner in East Pakistan 1964	A. M. A. Muhith	টাঃ ১৬/-
১২।	Administration Policy of the Government of Bengal, 1965	Rokeya Rahman Kabeer	টাঃ ৩০/-
১৩।	Bengal Dist. Administration Committee, 1966 - Govt. of Bengal	Published by NIPA	টাঃ ৩৫/-
১৪।	Famine Manual, 1967 - Govt. of Bengal	Published by NIPA	টাঃ ৭/-
১৫।	Problems of Municipal Administration, 1968	M. A. Hussain Khan	টাঃ ৩৫/-
১৬।	Our Cities and Towns, 1970	Md. Jainul Abdin Ed.	টাঃ ২৩/-
১৭।	Administration reforms in Pakistan, 1970	A. N. Shamsul Hoque	টাঃ ৩০/-
১৮।	Social and Administrative Research in Bangladesh, 1973	Naj Nor Begam	টাঃ ১৬/-
১৯।	Social Change and Development in South Asia 1978	Lutful Haq Chowdhury	টাঃ ৪৫/-
২০।	District Administration in Bangladesh 1978	Qazi Azhar Ali	টাঃ ২২/-
২১।	Bangladesh Public Administration and Senior Civil Servants, 1984	Ali Ahmed	টাঃ ৫০/-
২২।	Post-Entry Training in Bangladesh Civil Service : The Challenge and response 1986	Published by BPATC SAVAR, Dhaka	টাঃ ৪০/-

নং	বইয়ের নাম	লেখকের নাম	মূল্য
২৩।	Career Planning in Bangladesh, 1986	Published by BPATC SAVAR, Dhaka	টাঃ ১২০/-
২৪।	Sustainability of Project for Higher Agriculture Education, 1988 & Others	A. T. M. Shamsul Huda and others	টাঃ ৪০/-
২৫।	Approaches to Rural Health Care : A Case Study of Gonoshastya Kendra, 1988	A. T. M. Shamsul Huda and others	টাঃ ৪০/-
২৬।	Sustainability of Rural Development Project : A Case Study of Rural Development Project in Bangladesh 1988	Akbar Ali Khan and others	টাঃ ৪০/-
২৭।	Sustainability of Primary Education Project in Bangladesh, 1989	A. K. M. Hedhayetul Huq and others	টাঃ ৪০/-
২৮।	Hand Book for the Magistrates, 2nd Ed.1990	Z. A. Shamsul Haq others	টাঃ ১০০/-
২৯।	A Study of the Use of Computers in Management Decision Making in the Public Sector of Bangladesh, 1991	Dr. Ekram Hossain and others A. K. M. Enamul Haque A. Z. M. Shafiqul Alam	টাঃ ৫০/-
৩০।	Administrative Science Review	Published by NIPA	টাঃ ১৫/-
৩১।	Decentralization & People's Participation in Bangladesh, 1983	Dr. Sk. Maqsood Ali M. Safiur Rahman Kshanada Moham das	টাঃ ১৫০/-
৩২।	The Revenue Administration of North Bengal, 1970	A. B. M. Mahmood	টাঃ ৩০/-
৩৩।	Hospital Administration, 1969	N. N. Chowdhury ed.	টাঃ ১৮/-
৩৪।	Survey of In-service Training Institution in East Pakistan, 1969	Syed Nuruzzaman	টাঃ ১৫/-
৩৫।	Bureaucracy in Bangladesh Perspective	A. Z. M. Shamsul Alam	টাঃ ৫০০/-
৩৬।	Limiting the Role of State Prescription of the World Bank & the Bangladesh Economy	Dr. Mir Obaidur Rahman	টাঃ ১০০/
৩৭।	The Assessment of El Nino Impacts and Responses	Dr. Ekram Hossain and others	টাঃ ২৫০/-

আরো তথ্য এবং ক্রয়ের অর্ডার দেয়ার জন্য প্রকাশনা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা-১৩৪৩। এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

লোকপ্রশাসন সাময়িকী বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অন্যতম নিয়মিত প্রকাশনা, এটি কেন্দ্রের ত্রৈমাসিক জার্ণাল। প্রতি ইংরেজী বছরের জানুয়ারী, এপ্রিল, জুলাই ও অক্টোবর মাসে এ সাময়িকী প্রকাশিত হয়। লোক প্রশাসন সাময়িকীতে কেন্দ্রের অনুষদ সদস্য, বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের সদস্যবৃন্দ, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান অনুষদের শিক্ষকবৃন্দ, বিভিন্ন কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ কর্তৃক বাংলা বা ইংরেজী ভাষায় লিখিত সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ক মৌলিক ও গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তবে লোক-প্রশাসন, উন্নয়ন অর্থনীতি, ব্যবস্থাপনা ও প্রশিক্ষণ বিষয়ক প্রবন্ধ এ সাময়িকীতে প্রকাশের জন্য অধিক গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হয়।

◆ প্রবন্ধটি মৌলিক এবং অন্য কোন জার্ণালে বা সাময়িকী, সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়নি বা প্রকাশের জন্য প্রেরিত হয়নি-এ মর্মে প্রবন্ধ জমাদেয়া বা প্রেরণের সময় একটি লিখিত বিবৃতি প্রদান করতে হবে

◆ লেখা মানসম্পন্ন সাদা কাগজে (রিপোর্ট সাইজ) পর্যাপ্ত মার্জিন রেখে এক পৃষ্ঠায় ১২ ফন্টে ডাবল স্পেসে কম্পিউটারে মুদ্রিত হতে হবে। মুল পান্ডুলিপির সংগে অবশ্যই কম্পিউটার ডিস্কেটে প্রবন্ধ প্রেরণ করতে হবে। কম্পিউটার কম্পোজের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত ফন্টের ব্যবহার অনুসরণ করতে হবেঃ বাংলা কম্পোজ ঃ "বিজয় সুতন্নি" ফন্ট

ইংরেজী কম্পোজ ঃ "টাইমস নিউ রোমান" ফন্ট

◆ প্রেরিতব্য কম্পিউটার ডিসকেটের কভারে লেখকের নাম, লিখিত প্রবন্ধের নাম এবং সংশ্লিষ্ট ফাইলের নাম উল্লেখ থাকতে হবে

◆ প্রবন্ধে বাংলা একাডেমী অনুমোদিত বানান পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে

◆ মুল কপিসহ পান্ডুলিপির ২ (দুই) প্রস্থ (পরিচ্ছন্ন কপি) সম্পাদকের বরাবরে পাঠাতে হবে। প্রবন্ধের উপর আলাদ কাগজে (কভারপেজ) প্রবন্ধের শিরোনামসহ লেখকের নাম, পদবী ও ঠিকানা উল্লেখ করতে হবে, প্রবন্ধের কোথাও লেখকের নাম উল্লেখ করা যাবে না

◆ ভিন্ন কাগজে লেখকের সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত প্রবন্ধের সাথে সংযুক্ত করতে হবে

◆ প্রত্যেক লেখার সাথে অবশ্যই প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তসার (Abstract) ইংরেজীতে অনধিক ১৫০ শব্দের মধ্যে প্রেরণ করতে হবে

◆ প্রবন্ধের পাদটিকায় ও তথ্যপঞ্জিতে লেখক, গ্রন্থ স্থান, প্রকাশক, বছর ও পৃষ্ঠা এবং সাময়িকীর ক্ষেত্রে লেখক, প্রবন্ধের নাম, সাময়িকীর নাম, খন্ড ও ইসু সংখ্যার বছর ও পৃষ্ঠা প্রচলিত প্রমিত নিয়ম (Standard) অনুসারে উল্লেখ করতে হবে

◆ লেখা প্রকাশিত হলে লেখক সাময়িকীর ৫ কপি অনুলিপি বিনামূল্যে পাবেন

◆ প্রাপ্ত প্রবন্ধটি প্রকাশের ক্ষেত্রে সম্পাদনা পরিষদের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে এবং অমনোনীত প্রবন্ধ ও ডিসকেট সাধারণত লেখককে ফেরৎ দেয়া হয় না, তবে বিশেষ প্রয়োজনে ফেরৎ পেতে হলে এতদ্‌সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয়ভার লেখককে বহন করতে হবে।

◆ মুদ্রিত প্রবন্ধের ক্ষেত্রে প্রতি মুদ্রিত পৃষ্ঠার (২৫০ থেকে ৩০০ শব্দের পৃষ্ঠা) জন্য লেখককে ২০০ (দুইশত) টাকা হারে সম্মানী প্রদান করা হবে, এক্ষেত্রে সরকারী নিয়ম অনুসারে প্রাপ্য সম্মানী থেকে এক-তৃতীয়াংশ কর্তন করা হবে।